অধ্যায় ১৩

নারী আন্দোলন
[Women's Movements]

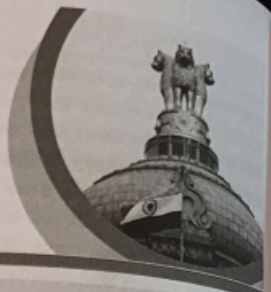

অধ্যায় সূচি

১। ভূমিকা। ২। প্রাক্-স্বাধীন ভারতে নারী-মুক্তি আন্দোলন। ৩। মহিলা সংগঠনসমূহ ও নারীর অবস্থা। ৪। প্রগতিশীল নেতাদের সামাজিক আন্দোলন ও নারীজাতি। ৫। জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও নারীর অংশগ্রহণ। ৬। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী। ৭। নারীবাদের উদ্ভব ও বিকাশ। ৮। স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতে নারী। ৯। বর্তমান ভারতীয় সমাজে নারী। ১০। সাংবিধানিক অধিকার ও অন্যান্য আইনানুমোদিত অধিকার এবং ভারতীয় নারী। ১১। নারী-আন্দোলনের প্রকারভেদ। ১২। স্বাধীন ভারতে নারী আন্দোলন। ১৩। নারী-আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা। ১৪। পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন। ১৫। জাতীয় মহিলা কমিশন। ১৬। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন।

১৩.১ ভূমিকা (Introduction)

লিঙ্গ বৈষম্য : নারী-পুরুষ ভেদে স্তরবিন্যাসের বিষয়টি ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় আবহমানকাল ধরে বর্তমান। স্বভাবতই এ রকম স্তরবিন্যাস ভারতীয় সমাজে স্বাভাবিক বলেই ধরে নেওয়া হয়। এমনকি ভারতীয় সমাজে নারী জাতির অবদমনকে অনেক সময় মহিমান্বিত করে প্রতিপন্ন করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। সাধারণভাবে ভারতীয় সমাজ হল পুরুষশাসিত ও পিতৃতান্ত্রিক। তবে অল্পকিছু ব্যতিক্রম আছে। পুরুষ-শাসিত সমাজে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্কগত বৈষম্য এবং মহিলাদের উপর অবিচার নিতান্তই সাধারণ ঘটনা। এ রকম সমাজে পুরুষের ভূমিকাই হল প্রাধান্যমূলক এবং নারীর ভূমিকাকে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তবে আধুনিক ভারতে মহিলাদের জীবনধারাগত পরিবর্তন ঘটেছে। এ কথা ঠিক। এতদ্‌সত্ত্বেও সনাতন হিন্দু সমাজের পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার পিছুটান এখনও সর্বাংশে কাটিয়ে ওঠা যায়নি। ভারতীয় সমাজে পুরুষের সমানাধিকার পেতে নারী জাতিকে এখনও সুদীর্ঘ সংগ্রামের দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হবে। ভারতে মহিলাদের জীবনধারাগত অবস্থায় পরিবর্তনহীনতা ও পরিবর্তনের মধ্যে সমাজতাত্ত্বিক দ্বান্দ্বিকতা পরিলক্ষিত হয়। এখনও এ দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক ব্যবস্থায় প্রচলিত প্রক্রিয়ায় মহিলাদের প্রতি বৈষম্য বহুলাংশে বহাল আছে। দুবে (S. C. Dube) তাঁর *Indian Society* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : "The social and political system appears geared to continue gender inequality. It seems that the march to equality will be long and tortuous."

সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা : নারী ও পুরুষের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কর্তৃত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় সাধারণত মহিলাদের উপর পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। তবে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী উদাহরণও আছে। যাইহোক সাম্প্রতিককালে ভারতীয় সমাজে নারী জাতির বিবিধ সমস্যা এবং মহিলাদের সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদাগত পরিবর্তন পর্যালোচনার ব্যাপারে সমাজতাত্ত্বিকদের আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ বিষয়ে বহু ও বিভিন্ন সমীক্ষা সম্পাদিত হয়েছে। বর্তমানে ভারতীয় মহিলারা বিবাহ, উত্তরাধিকার, জনজীবনে অংশগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে বিবিধ আইনানুগ অধিকার ভোগ করে। কিছু সমীক্ষায় এ

বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যায়। আবার সমাজতাত্ত্বিক গবেষকদের অনেকে বিদ্যমান প্রথা-রীতিনীতি, সনাতন বিধি-ব্যবস্থা, পুরুষদের সামাজিক মনোভাব প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদের বিরুদ্ধে অসাম্য-বৈষম্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন।

পরিবর্তনের সূত্রপাত : সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতিতে নারী জাতি পুরুষের দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হয়ে আসছে। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় ও পরিবার ব্যবস্থায় মহিলাদের মর্যাদা বরাবরই নিম্নমানের। বিংশ শতাব্দীর তিরিশের এবং চল্লিশের দশকের সময় থেকে এ বিষয়ে পরিবর্তনের অনুপন্থী আন্দোলন সংগঠিত হতে দেখা যায়। উদারনীতিক ও সাম্যবাদী মূল্যবোধের পক্ষে ভারতীয় মহিলাদের একটি অংশকে আন্দোলনের শামিল হতে দেখা যায়। সমকালীন ভারতের সামাজিক-রাজনীতিক নেতারাও উদারনীতিক ধ্যান-ধারণা ও সমতাবাদী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন। তাঁরাও নারীবাদী আন্দোলনকে সদর্থকভাবে প্রভাবিত করেন। ভারতীয় সমাজে মহিলাদের মর্যাদাগত অবস্থান সম্পর্কে সমকভাবে অবহিত হওয়ার জন্য বিষয়টি ইতিহাসগতভাবে বিচার-বিবেচনা করা দরকার। প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থা থেকে আধুনিক ভারতের সমাজব্যবস্থা পর্যন্ত নারী জাতির মর্যাদা ও অবস্থানগত বিবর্তন পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

১৩.২ প্রাক্-স্বাধীন ভারতে নারী-মুক্তি আন্দোলন (Women-Liberation Movement in Pre-Independence India)

বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষে নারী জাতির অবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক ছিল বলেই সাধারণভাবে মনে করা হয়। তারপর থেকে নারী জাতিকে পুরুষের অধীনস্থ রাখার ব্যবস্থা অবিরাম অব্যাহত। প্রাক্-ব্রিটিশ পর্বে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই নিহিত ছিল এ দেশের নারীজাতির হীনাবস্থার মূল। ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের মতো প্রতিবাদী সংস্কারমূলক ধর্মীয় আন্দোলনসমূহ নারী জাতির দুরবস্থার লাঘবের ক্ষেত্রে সদর্থক উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেছে। একথা ঠিক। কিন্তু বহু শতাব্দী ধরে নারীজাতির উপর আরোপিত হয়েছে পাহাড়-প্রমাণ সামাজিক-নৈতিক অন্যায়-অবিচার। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে তার অপসারণ ছিল অসম্ভব। বস্তুত ব্রিটিশ আমলেই সংগঠিত হয়েছে নারীমুক্তির উদ্দেশ্যে সদর্থক বড়ো বড়ো আন্দোলন।

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে নতুন আর্থনীতিক ও আইনী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই পক্ষে পশ্চিমী গণ-যন্ত্রিক ধ্যান-ধারণার সংস্পর্শে আসে এ দেশের নারী জাতি। ব্রিটিশ আমলে নতুন রাজনীতিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং নতুন আর্থনীতিক পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়। এই সময় এ দেশের মানুষের মধ্যে পশ্চিমী আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং নতুন ধ্যান-ধারণার বিকাশ ও বিস্তার ঘটে। স্বাভাবিকভাবে ব্রিটিশ ভারতে এক সাধারণ জাতীয় ও গণতান্ত্রিক জাগরণের সৃষ্টি হয়। এ রকম এক পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের মধ্যে ভারতের নারীজাতির বহু শতাব্দীব্যাপী সহ্য করা সামাজিক হীনাবস্থা ও মধ্যযুগীয় অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে মুক্তি আন্দোলন সংগঠিত হয়।

নারীর মর্যাদার উন্নয়ন : ব্রিটিশ ভারতে নতুন সব অধিকার প্রবর্তিত হয়। তার ফলে বিভিন্ন বাস্তব ও বিষয়ী শক্তি উন্মুক্ত হয়। সমকালীন ভারতের সামাজিক বিন্যাসের রূপান্তর সাধিত হয়। জনসাধারণের মধ্যে গণ-যন্ত্রিক চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটে। জনজীবনে নতুন সামাজিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এই সময় বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। নারী জাতির বিরুদ্ধে সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসা অন্যায়-অত্যাচার, অসাম্য-বৈষম্য, নির্যাতন প্রভৃতির অবসান কল্পে উদ্যোগ-আয়োজনের সূত্রপাত ঘটে। সতীদাহ ও শিশুহত্যার মতো অমানবিক প্রথার নির্যাতন নারীরা সহ্য করছে অসংখ্য শতাব্দীব্যাপী। সতীদাহ প্রথার অবসানের পরেও বিধবাদের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা সহজে চালু করা যায়নি। দেবদাসী প্রথার ন্যায় একটি বর্বর প্রথাও চালু ছিল। সতীদাহ প্রথার বিলোপসাধনের উদ্দেশ্যে রাজা রামমোহন রায় সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন সংগঠিত করেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক অবশেষে ঐ অমানবিক প্রথার অবসান ঘটান। কালক্রমে শিশু হত্যাও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। বাল্য বিবাহের অভিশাপও মূলত

মেয়েদেরই সহ্য করতে হত। ১৮৬৪ সালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে বাল্য বিবাহ বিরোধী একটি আইন প্রণীত হয়। এই আইনে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স করা হয় দশ। ১৮৫৬ সালে প্রণীত আইনের ভিত্তিতে বিধবা বিবাহ আইনী স্বীকৃতি লাভ করে। এ ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের অবদান অনস্বীকার্য। ১৯২৯ সালে 'শিশু বিবাহ নিয়ন্ত্রণ আইন' (Child Marriage Restraint Act, 1929) প্রণীত হয়। এই আইনে মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স বাড়িয়ে করা হয় ১৪ এবং ছেলেদের ১৮।

শিক্ষার অধিকার অর্জন : মধ্যযুগীয় ধারণা অনুযায়ী শুধুমাত্র পারিবারিক কর্তব্য সম্পাদনের মধ্যেই নারীজাতির ভূমিকা সীমাবদ্ধ। প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে নারীজাতি বঞ্চিত ছিল। ভারতে ব্রিটিশ শাসন কায়েম হওয়ার পর সুদীর্ঘকালের সনাতন সমাজব্যবস্থা হীনবল হয়ে পড়ে। নতুন এক অপেক্ষাকৃত উদারনীতিক সমাজব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটে। তার ফলে ভারতের মানুষজনের মধ্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চারিত হয়। উদারনীতিক ধ্যান-ধারণার বিকাশ ও বিস্তার ঘটে। আগেকার কর্তৃত্বপরায়ণ মানসিকতা ক্রমশ শিথিল হতে থাকে। এই ধারণা ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকে যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা ও সমানাধিকার স্বীকৃত হওয়া দরকার। ব্রিটিশ আমলে শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নারীজাতির সমানাধিকার মোটামুটি সর্বজনীনভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। এই সময় নারীজাতির মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটে। শিক্ষালাভের ব্যাপারে মেয়েদের রক্ষণশীলতার বাঁধন আলগা হয়ে পড়ে। কালক্রমে ছেলেদের মতো মেয়েদের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য হয়ে উঠতে থাকে। ব্রিটিশ ভারতে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কার সংস্থা ও মিশনারী সোসাইটি। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে আর্যসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন এবং ব্রিটিশ, ডেনমার্ক, মার্কিন ও জার্মান মিশনারিদের কথা বলা যায়।

রাজনীতিতে অংশগ্রহণ : বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের একেবারে গোড়ার দিক থেকেই ভারতীয় রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে রাজকীয় বা বিশিষ্ট কিছু পরিবারের দু'একজন মহিলা ব্যতিরেকে সাধারণভাবে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়নি। ব্রিটিশ ভারতে মহিলারা তাদের সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। জাতীয় কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী গণ-আন্দোলনে তারা সাধ্যমতো যোগ দিয়েছে। এই সময় মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেস জাতীয় প্রয়াসের শামিল হওয়ার জন্য নারীজাতির কাছে আহ্বান জানান। এই সময় ভারতের মহিলারা সক্রিয়ভাবে জাতীয়তাবাদী বড়ো ধরনের বিভিন্ন আন্দোলনের শামিল হয়েছেন। বিভিন্ন রাজনীতিক কর্মসূচির আলোচনায় তাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন এবং মতামত দিয়েছেন। শয়ে শয়ে মহিলা রাজনীতিক গণআন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা মিটিং-মিছিলের শামিল হয়েছেন, মদের দোকানে পিকেটিং করেছেন, পুলিশি নির্যাতনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন, কারাবাস করেছেন। এসব কিছুই সমকালীন ভারতীয় মহিলাদের দায়িত্বশীল নাগরিক চেতনাকে প্রকাশিত করেছে। প্রমাণিত হয়েছে তারা স্বামী বা পুরুষকর্তার অধীন দাসী নয়; তাঁরা দেশের দায়িত্বশীল নাগরিক। সমকালীন ভারতীয় মহিলাদের কেউ কেউ বিচক্ষণ নেতৃত্বমূলক ভূমিকার সুবাদে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, সরোজিনী নাইডু, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, সরোজ-নলিনী দত্ত প্রমুখ যশস্বীনীদের নাম করা যায়। অতঃপর অনেক মহিলাই প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য হয়েছেন, প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী হয়েছেন, আইনসভার উপাধ্যক্ষ হয়েছেন, সরকারের সহ-সচিব পদে কাজ করেছেন প্রভৃতি।

মহিলা সংগঠনের সৃষ্টি : ভারতে ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলনের একটি বড়ো বিষয় ছিল মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা। গোড়ার দিকে আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল মহিলাদের মর্যাদা বিরোধী সতীদাহ, শিশুকন্যা হত্যা, বিধবাদের পুনর্বিবাহের বিরোধিতা প্রভৃতির বিলোপ সাধন। পরবর্তীকালে নারী শিক্ষার প্রতি নজর দেওয়া হয় এবং জনজীবনে মহিলাদের শামিল করার চেষ্টা করা হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই একটি সর্বভারতীয় মহিলা সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে কিছু মহিলা নেত্রীর মধ্যে সচেতনতার সৃষ্টি হয়। মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত এই সংগঠনের কাজ হবে নারীজাতির সমস্যাদির মোকাবিলা করা। ১৯১০ সালে সরলাদেবী চৌধুরাণী 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১০ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে, অর্থাৎ

পরবর্তী এক দশকের মধ্যে মহিলাদের জন্য বেশ কয়েকটি সামাজিক সংগঠনের সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশ ভারতের এবং দেশীয় নৃপতি শাসিত রাজ্যের মহানগর ও শহরগুলিতে এই সমস্ত মহিলা সংগঠন গড়ে ওঠে। বিভিন্ন নামে এগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। উদাহরণ হিসাবে 'মহিলা সমিতি', 'মহিলাদের ক্লাব', 'লেডিস সোসাইটি' প্রভৃতির কথা বলা যায়। মাদ্রাজের (চেন্নাই) মহিলারা ১৯১৭ সালে 'উয়োমেনস্ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' (Women's Indian Association) নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। এই সংগঠনটি অনেক শাখা-সংগঠনের সৃষ্টি করে এবং সমকালীন বিভিন্ন ছোটোখাটো সংস্থার সঙ্গে সংযোগ-সম্পর্ক গড়ে তোলে। পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে আরও দুটি সর্বভারতীয় সংগঠনের সৃষ্টি হয়। এই দুটি সংগঠন হল : 'ভারতের মহিলাদের পরিষদ' (National Council of Women in India) এবং 'মহিলাদের সর্বভারতীয় সম্মেলন' (All India Women's Conference)। প্রথমটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৫ সালে এবং দ্বিতীয়টি পরের বছর ১৯২৬ সালে। প্রথমটির সদস্যসংখ্যা ১৯৩২ সালের মধ্যে ৫ হাজার ছাড়িয়ে যায়।

সমকালীন ভারতে স্থানীয় ও জাতীয় স্তরের মহিলা-সংগঠনসমূহে নেত্রীরা আন্তরিকতার সঙ্গে সক্রিয় রয়েছেন। মহিলা সংগঠনসমূহের কার্যকলাপকে অসংখ্য মহিলা সমর্থন করেছেন। তাঁরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শামিল হয়েছেন। এই সমস্ত কিছুর সমাহারে সৃষ্টি হয়েছে নারীজাতির আন্দোলন। এই সময় দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম এবং মহিলাদের মর্যাদার উন্নতি সাধনের জন্য উদ্যোগ-আন্দোলনকে পৃথকভাবে দেখা যায়নি। উভয় ধরনের উদ্যোগেই মহিলাদের শামিল করার চেষ্টা হয়েছে। মহাত্মা গান্ধির অভিমত অনুযায়ী রাজনীতিক আন্দোলনের মধ্যেই সামাজিক ও নৈতিক পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্য বর্তমান। এবং এই রাজনীতিক আন্দোলনের কর্মসূচিতে মহিলাদের ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। গান্ধিজি ঘরের বাইরে অহিংসা সংগ্রামের শামিল হওয়ার জন্য নারীজাতির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি মিটিং-মিছিলে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁতে কাপড় বোনা, খাদির ব্যবহার, শিক্ষা প্রদান, বিভিন্ন পরিষেবামূলক কাজকর্ম প্রভৃতির উপর জোর দিয়েছেন। অনুরূপভাবে আবার অরাজনীতিক সামাজিক সংগঠনসমূহ উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। সমকালীন ভারতে সর্বভারতীয় নেত্রীদের মধ্যে সরোজিনী নাইডু ছিলেন বিশেষভাবে বিখ্যাত। তিনি প্রথম শ্রেণির বহু সামাজিক ও রাজনীতিক সংগঠনসমূহের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। অপরদিকে সরোজ-নলিনী দত্ত বাংলায় মহিলা সমিতি আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন।

১৩.৩ মহিলা সংগঠনসমূহ ও নারীর অবস্থা (Women Organisation and the Women)

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে নারীজাতির স্বার্থ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু মহিলা সংগঠনের সৃষ্টি হয়েছিল। জাতীয় স্তরের মতো আঞ্চলিক স্তরেও এরকম মহিলা সংগঠনের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে তৃতীয় দশকের মধ্যে এই সমস্ত সংগঠন গড়ে ওঠে। সমকালীন মহিলা সংগঠনসমূহের দুটি মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম উদ্দেশ্য হল নারী ও পুরুষের সমানাধিকার সুনিশ্চিত করা। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনীতিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে পুরুষেরা বহু ও বিভিন্ন অধিকার ভোগ করে। এই সমস্ত অধিকার ভোগ নারীজাতির জন্য সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্য ছিল। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল মহিলাদের সামাজিক উন্নতি বা প্রগতির ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমকালীন প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের পরিবর্তন বা সংস্কার সাধনের কথা বলা হয়। এই সংস্কার সাধনের লক্ষ্য ছিল সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের গঠনমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় মহিলাদের প্রতিষ্ঠিত করা।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতীয় মহিলারা বিভিন্ন মহিলা সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে ব্যাপকভাবে উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেন। ভারতীয় মহিলাদের এই উদ্যোগের পিছনে কতকগুলি বিষয় উদ্দীপক হিসাবে কাজ করেছে। সমকালীন ভারতের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিক নেতারা নারী-আন্দোলন সংগঠিত করার ব্যাপারে

সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। এই সমস্ত নেতাদের এই সাহায্য-সহযোগিতা ছিল সক্রিয় ও আন্তরিক। বস্তুত এ বিষয়ে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিক নেতাদের মনোভাব ছিল কল্যাণমূলক। ইংরেজদের সুদীর্ঘ শাসনের সুবাদে ইতিমধ্যে ভারতে পশ্চিমী শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছিল। এই শিক্ষার কল্যাণে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক ভূমিকার পরিপূরক প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী মহিলাদের নিয়ে একটি এলিট শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছিল। এই এলিট শ্রেণির মহিলারা নারী-আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সমকালীন ভারতে বেশ কিছু প্রথিতযশা পুরুষ সমাজসংস্কারকের আবির্ভাব ঘটেছিল। এই সমস্ত সমাজসংস্কারকরা প্রচলিত বিভিন্ন বিষয়ের পরিবর্তন বা সংস্কার সাধনের ব্যাপারে উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মানুমোদিত সামাজিক বিধি-ব্যবস্থাসমূহের মৌলিক পরিবর্তন সাধনের ব্যাপারে তাঁরা সক্রিয় ছিলেন। প্রচলিত সমকালীন সামাজিক, ধর্মীয় ও দার্শনিক ধ্যান-ধারণার পরিবর্তনের ব্যাপারে তাঁরা সচেষ্ট ছিলেন। আবার সামাজিক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব সংঘাতসমূহকে যথাসম্ভব হ্রাস করা এবং মহিলা সংগঠনসমূহের প্রতি পুরুষদের বিরোধিতার মানসিকতার অবসানের ব্যাপারে সমাজসংস্কারকরা উদ্যোগী হয়েছিলেন।

নারীজাতির স্বার্থে আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে জাতীয় স্তরের মহিলা সংগঠনসমূহ স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছে। জাতীয় পর্যায়ের এই সমস্ত মহিলা সংগঠনের মধ্যে কতকগুলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমেই 'ভারত মহিলা পরিষদ'-এর নাম করতে হয়। ১৯০৪ সালে এই সংগঠনটি কাজ শুরু করে। মহিলাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামই ছিল এই সংগঠনটির মূল উদ্দেশ্য। অনুরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল'। অ্যানি বেসান্ত (Annie Besant)-এর উদ্যোগে ১৯১৭ সালে 'উয়োমেনস ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' (Women's Indian Association) নামে মহিলাদের একটি সংগঠন জাতীয় স্তরে কাজকর্ম শুরু করে। ১৯২৫ সালে লেডি টাটা ও লেডি অ্যাবারডেন (Aberden)-এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ভারতের মহিলাদের জাতীয় সংসদ' (National Council of Women Association)। এ প্রসঙ্গে 'কস্তুরবা গান্ধি জাতীয় স্মৃতি ট্রাস্ট' এবং 'সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলন'-এর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সমকালীন ভারতে আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক পর্যায়েও কিছু কিছু মহিলা সংগঠনের সৃষ্টি হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে 'বঙ্গ মহিলা সমাজ' ও 'মহিলাদের থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি-র নাম করা দরকার। আঞ্চলিক মহিলা সংগঠনগুলিও নারীজাতির স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে পশ্চিমী ও আধুনিক ধ্যান-ধারণাকে তুলে ধরার ব্যাপারে উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেছিল।

জাতীয় ও স্থানীয় স্তরের মহিলা সংগঠনসমূহ নারীজাতির স্বার্থ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে বিবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বহু ও বিভিন্ন বিষয়ে এই সমস্ত সংগঠন সদর্থক ভূমিকা পালন করেছে। নারী শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তারের ব্যাপারে এই সংগঠনগুলি সক্রিয় হয়েছে। বাল্যবিবাহ, পর্দাপ্রথা প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধি নিরাময়ের ব্যাপারে সংগঠনগুলি সচেস্ট হয়েছে। নারী ভোটাধিকারের জন্য এবং বিবিধ বিষয়ে সুযোগ-সুবিধা ও অধিকারের ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য মহিলা সংগঠনগুলি সংগ্রামের শামিল হয়েছে। নৈতিক ও বৈত্তিক ক্ষেত্রে মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং নারীজাতির স্বার্থে হিন্দু আইনের সংস্কার সাধনের ব্যাপারেও মহিলা সংগঠনগুলি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।

সমকালীন মহিলা সংগঠনসমূহ নিজেদের কর্মসূচি কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন উপায়-পদ্ধতি অবলম্বন করত। নিজেদের দাবি-দাওয়া ও কর্মসূচির ব্যাপক প্রচার এবং সহায়ক জনমত সংগঠিত করার জন্য মহিলা সংগঠনসমূহ জনসভার আয়োজন করত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীজাতির স্বার্থ সম্পর্কিত মহিলাদের অবহিত ও অনুপ্রাণিত করার জন্য সংগঠনগুলি মহিলাদের সম্মেলন আহ্বান করত। মহিলাদের অভাব-অভিযোগ ও বিদ্যমান অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য এই সমস্ত সংগঠন অনেক সময় কমিটি গঠন ও নিয়োগ করত। বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের মতামত ও অভাব-অভিযোগ মহিলা সংগঠনগুলি সরকারি আধিকারিকদের কাছে পেশ করত।

১৩.৪ প্রগতিশীল নেতাদের সামাজিক আন্দোলন ও নারীজাতি (Social Movements of the Progressive Leaders and the Women)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারীজাতির উপর বিবিধ অসামর্থ্য আরোপ ...রা হয়। নারীস্বার্থবিরোধী সাবেককালের স্মার্ত অনুশাসনের বিবিধ বিধি-নিষেধ এই সময় প্রয়োগ করা হয়। ...ত্রীশিক্ষার উপর নিয়ম-নিষেধ আরোপ করা হয়। শিশু কন্যা বিবাহ এবং বিবাহের জন্য কন্যা বিক্রয় ব্যবস্থার ...ও এই সময় পরিলক্ষিত হয়। পুরুষের বহুবিবাহ বা বহুপত্নীত্ব ব্যবস্থাও ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় ভালোভাবেই ...ু ছিল। এই সময় মহিলাদের মূলত শিশুর লালন-পালন ও ঘরকন্নার কাজে ব্যাপৃত ও সীমাবদ্ধ রাখা হত। ...বাদের উপর বিবিধ কঠোর নিয়ম-নিষেধ আরোপ করা হত।

নারীজাতির উপর আরোপিত এই সমস্ত সামাজিক অন্যায়-অত্যাচার সমকালীন ভারতের সকল মানুষ মুখ ...ে সহ্য করেননি। এই সময় প্রগতিশীল মানসিকতা সম্পন্ন এবং দৃঢ়চিত্তের বেশ কিছু প্রাতঃস্মরণীয় মানুষ ...রতে জন্মগ্রহণ করেন। বরণীয় এই সমস্ত ভারত-সন্তান নারীবিরোধী এই সমস্ত অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে ...তিবাদ করেছেন এবং প্রতিকারের জন্য সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলন সংগঠিত করেছেন। প্রগতিশীল ...দের সংস্কারমূলক প্রতিবাদী আন্দোলনের পরিণামে সামাজিক ক্ষেত্রে সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে। এবং এই ...চেতনতার সুবাদে নারীজাতির স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের ধারণা অধিকতর জোরদার হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে ভারতে নারী-আন্দোলনের উৎস বহুলাংশে নিহিত আছে বিংশ শতাব্দীর সামাজিক সংস্কার ...ন্দোলনের মধ্যে। সামাজিক সংস্কার আন্দোলন কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যে নয়, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, পারসি ...ভৃতি ভারতের বিভিন্ন সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়সমূহের মধ্যেও সংঘটিত হয়েছে। নারী জাতির স্বার্থবিরোধী ...ভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা ও বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সমাজ সংস্কারক সক্রিয় আন্দোলনের শামিল ...য়েছেন। এই সমস্ত সমাজ সংস্কারকদের মধ্যে যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন রাজা ...মমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, বেহরামজি মালবারি প্রমুখ। এই সমস্ত ...জ সংস্কারকদের ভূমিকায় অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত ব্রিটিশ সরকার কতকগুলি প্রগতিমূলক আইন প্রণয়ন ...য়। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে সতীদাহ প্রথা বিরোধী আইন, বিধবা বিবাহ আইন, বাল্য বিবাহ বিরোধী আইন ...ভৃতি উল্লেখযোগ্য। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের ব্যাপারেও ব্রিটিশ সরকার উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করে। তবে নারীজাতির ...র্থ সম্পর্কিত প্রগতিশীল আন্দোলনসমূহে মহিলাদের অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে ঘটেনি।

বিচারপতি রাণাডে (Ranade)-র উদ্যোগে ১৮৮৫ সালে 'ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন' (Indian National ...nference) প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন নারীজাতির উপর আরোপিত যাবতীয় অসামর্থ্যের ...দ্ধে প্রতিবাদ জানায় ও নিন্দা করে। রাজা রামমোহন রায় ভারতে আধুনিক যুগের এক বিশিষ্ট পুরোহিত ...রে পরিচিত। ভারতে সমাজ সংস্কার ও নারীজাতির অবস্থার উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে রাজা রামমোহনের ...ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রয়াত স্বামীর চিতায় সদ্য বিধবার সহমরণের বা সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে ...ি গর্জে উঠেছিলেন এবং এই প্রথার অবসানের ব্যাপারে সদর্থক ভূমিকা পালন করেছিলেন। পর্দাপ্রথা ও ...বিবাহের বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেছেন। আবার সম্পত্তিতে মহিলাদের উত্তরাধিকারের ...ে রাজা রামমোহন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

সমকালীন ভারতে সমাজসংস্কার ও নারীজাতির দুর্দশা মোচনের ক্ষেত্রে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম ...ভাবে উল্লেখযোগ্য। নারীশিক্ষা এবং বিধবা বিবাহের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের বিশেষ অবদান সর্বজনস্বীকৃত। ...লীন ভারতে মহিলাদের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনীতিক অধিকার সম্পর্কে আরও অনেকে ঐকান্তিক ...ও আন্তরিকতা দেখিয়েছেন। এঁদের মধ্যে অ্যানি বেসান্ত (Annie Besant), স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী ...কানন্দ, মহাত্মা গান্ধি প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গান্ধিজি পুত্র-কন্যার

পরিপূর্ণ সমানাধিকারের কথা বলেছেন এবং মহিলাদের উপর আরোপিত যাবতীয় অসামর্থ্যের অবসানের কথা বলেছেন।

বরোদার মহারাজা সায়াজি রাও গায়কোয়াড় বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহ প্রতিরোধের ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি নারীশিক্ষার বিকাশ ও বিস্তার এবং বিধবা বিবাহ প্রচলনের ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। বিধবার পুনর্বিবাহের অধিকার এবং নারীর শিক্ষার অধিকারের স্বীকৃতি ও সম্প্রসারণের জন্য মহর্ষি কার্ভে (Karve) যথাসাধ্য উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেছেন।

সমভোটাধিকার, আইনসভায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি নারীজাতির রাজনীতিক অধিকারসমূহ সম্পর্কে নারী-নেতৃত্ব দাবি জানায়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই দাবিকে সমর্থন জানায়। নারী শিক্ষার বিস্তারের ব্যাপারে সমকালীন মহিলা সংগঠনগুলি সক্রিয় হয়। উদাহরণ হিসাবে 'সারা ভারত মহিলাদের কন্‌ফারেন্স' (AIWC—All India Women's Conference), 'মহিলাদের ভারতীয় সংঘ' (Women's Indian Association) প্রভৃতি সংগঠনের নাম উল্লেখযোগ্য। বিংশ শতাব্দীর কুড়ির দশকে এই সমস্ত সংগঠনের সৃষ্টি হয়। স্বাধীন ভারতে এই সমস্ত সংগঠন নারী জাতির স্বার্থ সম্পর্কিত অনুরূপ বিষয়াদি উত্থাপন করেছে এবং নারী কল্যাণমূলক বিবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মহিলাদের এই সমস্ত সংগঠন ছিল সর্বভারতীয় মর্যাদাযুক্ত। তবে সকল রাজ্যে তাদের শাখা ছিল না।

বিভিন্ন সমাজসংস্কারক ও মহিলা সংগঠনসমূহ নারী জাতির স্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যাদি উত্থাপন করেছে। তার ফলে বৈদিক আমলের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মতাদর্শে আঘাত লেগেছে। সমাজ সংস্কারকদের অনেকেই সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকার পৃথকীকরণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এই শ্রেণির সমাজ সংস্কারকরা ঘরের বাইরে মহিলাদের কাজকর্মের বিরোধিতা করেননি। তবে জনজীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাঁরা মহিলাদের স্বাধীন জীবন ও জীবিকাকে সমর্থন করেননি। তাঁদের মধ্যে এরকম ধারণাও অল্পবিস্তর বর্তমান ছিল যে, সকল ক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে মহিলাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা উচিত নয়। অপর্ণা বসু (Aparna Basu) তাঁর *The Role of Women in the Indian Struggle for Freedom* শীর্ষক এক রচনায় এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সমাজ সংস্কারকদের মধ্যে মোটামুটি এই ধারণাই বর্তমান ছিল যে, মহিলারা হবে সতীসাধ্বী, পতিব্রতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাযুক্ত। কল্পনা শাহ (Kalpana Shah) তাঁর *Women's Liberation and Voluntary Action* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : "...through its programmes the Parishad (AIWC) strengthens the traditional role of a woman as wife, housekeeper and mother.... They [such women's organisations] have become instruments in spreading an ideology which assigns inferior role to women."

সমকালীন সমাজব্যবস্থায় পর্দা প্রথা মহিলাদের পুরুষদের থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছিল। সর্ব সাধারণের বিষয়াদিতে মহিলাদের অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করা হত। অনেকের অভিমত অনুযায়ী এই পর্দা প্রথা মহিলাদের মধ্যে এক ধরনের সংহতির সৃষ্টি করেছিল। ঘনশ্যাম শা তাঁর *Social Movements in India* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : "This ideological implecation of purdah would tend to shape the goals of early women's movement leaders toward corporate ideas (improving women's performance of traditional female roles) and away from liberal ideals (achieving identical rights for man and woman)."

তবে ব্রিটিশ আমলে ভারতে উদারনীতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটতে থাকে। উচ্চবিত্ত শ্রেণির মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার বিষয়টিকে উৎসাহ দেওয়া হয়। এই সুবাদে নারী ও পুরুষের মধ্যে ব্যবধানটি দূর করার ব্যাপারেও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সামাজিক শ্রেণির গৃহবধূরা পশ্চিমী শিক্ষায় তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করতে শুরু করে। এই সময় জাতীয় বুর্জোয়ারা একযোগে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ও মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শামিল হয়। সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রক্রিয়ার শামিল পুরুষ সমাজ সংস্কারকদের পীড়নমূলক প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে ঘনশ্যাম শা মন্তব্য করেছেন : "The goal

of the social reformers was to inculcate and entrench the bourgeois norms of monogamy and the unclear family which and are the cornerstones of capitalist development."

১৩.৫ জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও নারীর অংশগ্রহণ (Nationalist Politics and the Participation of women)

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে স্বদেশী আন্দোলনের পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের মধ্যে সমকালীন রাজনীতির প্রতি মহিলাদের আগ্রহ ও আন্তরিকতার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালেও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে এই আগ্রহ অব্যাহত থাকে। বিদেশিনী অ্যানি বেসান্তের উদ্যোগে ১৯১৬ সালে 'হোমরুল লিগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদেশিনী বেসান্তের নেতৃত্বে হোমরুল আন্দোলন ভারতীয় নারী জাতিকে অনুপ্রাণিত করে। বেসান্ত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন। তাঁর নেতৃত্বে কলকাতায় কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্বভাবতই এ দেশের মহিলাদের মধ্যে এক নতুন উন্মাদনার সৃষ্টি হয়। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের শেষের দিকে এবং তিরিশের দশকের গোড়ার দিকে বাঙালি মহিলাদের মধ্যে রাজনীতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে এক ধরনের উন্মাদনা পরিলক্ষিত হয়। সমকালীন বাঙালি মহিলাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সক্রিয় রাজনীতিক কার্যপ্রক্রিয়ার শামিল হন। এই সময় বাংলার মতো সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও মহিলাদের রাজনীতিক কার্যধারায় দুটি মূল উদ্দেশ্য স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয়। এই দুটি উদ্দেশ্যের একটি হল দেশ ও দেশবাসীর জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামের শামিল হওয়া। এ ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সঙ্গে সহযোগিতামূলক উদ্যোগের অংশীদার হয়েছে। এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি হল নারীজাতির জন্য ভোটাধিকার আদায় করা। এই উদ্দেশ্যটি ছিল মূল মহিলাদের নিজস্ব বিষয়।

ভারতের সমকালীন মহিলাদের মধ্যে রাজনীতিক স্বাধীনতার চেতনা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল। তবে সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক চেতনারও বিকাশ ও বিস্তার ঘটে। এতদিন পর্যন্ত রাজনীতি ও ক্ষমতার এলাকা জুড়ে একান্তভাবে পুরুষদেরই একচ্ছত্র আধিপত্য অব্যাহত ছিল। এই সময় কিন্তু মহিলাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ চিরন্তন গৃহকোণের নিরাপত্তার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসেন এবং সক্রিয় রাজনীতির শামিল হন। এই শ্রেণির মহিলারা ঘরের বাইরের বিবিধ সামাজিক সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। নারীজাতির উপর সুদীর্ঘকালের শৃঙ্খল বহুলাংশে শিথিল হয়ে পড়ে। নারীজাতির জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। রাজনীতিকভাবে সচেতন মহিলাদের মধ্যে এই বোধ জাগ্রত হয় যে, পুরুষ-শাসিত ভারতীয় সমাজব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে এক স্থানের অন্যায়-অবিচার বরাবরই চলে আসছে। *Studies in History* শীর্ষক রচনায় পানিক্কর (K. M. Panikkar) এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, রাজনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মহিলাদের আবির্ভাবের ফলশ্রুতি হিসাবে নিজেদের বন্দিদশা সম্পর্কে নারী সমাজে সচেতনতার সৃষ্টি হয়। এবং এই কারণে পিতৃতান্ত্রিক রীতিনীতির শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগী হন। রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চেও আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষপ্রধান সমাজকে উপেক্ষা করেছেন এমন নয়। বরং বলা দরকার যে, প্রথমে পুরুষেরাই মহিলাদের এক্ষেত্রে উৎসাহ জুগিয়েছে। অতঃপর মহিলাদের মধ্যে এক গভীর আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে। জগৎ, জীবন ও নিজেদের সম্পর্কে নারীজাতির মধ্যে ধ্যান-ধারণার মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতে মহিলাদের আন্দোলন গড়ে উঠেছিল দেশের বিভিন্ন অংশের জনগণের মুক্তি-আন্দোলনের অংশ হিসাবে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রথম দুটি দশকের অধিককাল ধরে সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে বাঙালি মহিলারা দুঃসাহসিক এক অভিযানের শামিল হয়েছিলেন।

ভারতের সমাজব্যবস্থা বরাবরই পিতৃতান্ত্রিক। সাবেককালের এই সমাজ ব্যবস্থায় স্মার্ত অনুশাসনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। এ রকম সমাজের জীবনধারায় প্রচলিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে মহিলাদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। মহিলাদের মধ্যে একটি অংশ এই জীবনধারা ও মূল্যবোধকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা ঘরের ভিতরে ও বাইরে পুরুষের একাধিপত্যের অবসানের ব্যাপারে উদ্যোগী হন। পরিবারের গণ্ডির মধ্যে বন্দি জীবন পরিত্যাগ

করে ঘরের বাইরের জীবনধারা সম্পর্কে এই শ্রেণির মহিলারা সোচ্চার হন। বস্তুত মহিলাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে মূল্যবোধের মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। তবে একে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের শৃঙ্খল থেকে নারীমুক্তি বলা যাবে না। ক্রমশ অধিক সংখ্যায় মহিলা রাজনীতিকরা ও রাজনীতিক কর্মীরা নারীজাতির সামাজিক সীমাবদ্ধতা এবং অসামর্থ্য ও অসুবিধাদি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। তারা নারীর যাবতীয় বন্ধনমুক্তির ব্যাপারে সক্রিয় হন। অনেক মহিলাই বিদেশী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এবং সামাজিক অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে অভিন্ন দৃঢ়তা সহকারে সংগ্রাম করেছেন। দুর্গত ও নির্যাতিত মহিলাদের সাহায্য করার জন্য রাজনীতিক মহিলা সংগঠকরা সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী হয়েছেন। নারীজাতির সামাজিক পরিবেশ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা সম্যকভাবে অনুধাবন করেছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা সংগঠন গড়ে তুলেছেন। এই প্রসঙ্গে সরলা দেবী চৌধুরাণী থেকে আরম্ভ করে আশালতা সেন পর্যন্ত প্রায় সকল রাজনীতিক মহিলা সংগঠকই সক্রিয় ও সদর্থক ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলার তো বটেই, বাংলার বাইরের অনেক ভারতীয় মহিলা ব্রিটিশ সরকার ও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসামান্য দৃঢ়তা সহকারে সংগ্রামে শামিল হয়েছেন। মহিলারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আইন-অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। স্বভাবতই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এবং পরবর্তীকালে ভারতের গণ-পরিষদে সংবিধান প্রণয়নের প্রাক্কালে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে।

১৩.৬ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী (Liberation Movement and Women)

ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবী মহিলাদের আত্মনিবেদনের অধ্যায়টি হল ভারত ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সমকালীন ভারতের মহিলারা পরোক্ষভাবে বিপ্লবীদের সাহায্য-সহানুভূতি জানানোর মধ্যেই নিজেদের ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারতেন। সনাতন ভারতের পুরুষপ্রধান সমাজে নিপীড়িত ও অসহায় নারীজাতির পক্ষে সেটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু সে সময়ে ভারতের মহিলারা তা করেননি। সমকালীন ভারতের মহিলাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পরিবারের নিরাপদ আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং বিপ্লবী আন্দোলনকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, অনেক মহিলা রাজনীতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ঘনশ্যাম শা তাঁর *Social Movements in India* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : "Some scholars assert that the freedom movement helped women in their struggle for 'liberation', as femenism and nationalism were closely interlinked."

বাসন্তী দেবী ও উর্মিলা দেবী : মহাত্মা গান্ধি অসহযোগ আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ করেন ১৯২০ সালে। বাংলায় এই আন্দোলনের নেতৃত্ব ন্যস্ত হয় চিত্তরঞ্জন দাশ এবং তাঁর সহধর্মিণী বাসন্তী দেবীর উপর। বিদেশী দ্রব্যসামগ্রী বয়কট আন্দোলনে এবং স্বদেশী খদ্দরের প্রচার ও প্রসারে বাসন্তী দেবী নেতৃত্ব দেন। ব্রিটিশ সরকার বাসন্তী দেবীকে গ্রেপ্তার করে ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের ৭ তারিখে। তাঁর সঙ্গে সুনীতি দেবী ও উর্মিলা দেবীকেও গ্রেপ্তার করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, উর্মিলা দেবী ছিলেন বাসন্তী দেবীর ননদ। যাই হোক ইংরেজ সরকার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁদের ছেড়ে দেয়। কিন্তু এই গ্রেপ্তারের ঘটনা জনমানসে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই গ্রেপ্তারের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। মহিলা রাজনীতিকদের গ্রেপ্তারের ঘটনা নারীসমাজে প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে; একটি উন্মাদনা সৃষ্টিকারী দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়। এই দৃষ্টান্ত ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গতির সঞ্চার করে। চিত্তরঞ্জন দাশ কারারুদ্ধ হলেন। এই সময় ১৯২১ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি পদে নিযুক্ত করা হল বাসন্তী দেবীকে। একজন বাঙালি মহিলা রাজনীতিক নেতৃত্বের সামনের সারিতে প্রতিষ্ঠিত হলেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে এ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

চট্টগ্রামে ১৯২২ সালে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এই সম্মেলনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করলেন বাসন্তী দেবী। এই সম্মেলনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনস্বীকার্য। কারণ এই সম্মেলনে রেকর্ড সংখ্যক মহিলার সমাগম ঘটেছিল। অনেকের অভিমত অনুযায়ী মহিলাদের এই অভূতপূর্ব সম্মেলন ছিল বাঙালি নারী সমাজের রাজনীতিক জাগরণের পরিচয়বাহী। আবার অনেকে বলেছেন মহিলা রাজনীতিক বাসন্তী দেবীর সভাপতিত্বের আকর্ষণেই এই সম্মেলনে বিপুল সংখ্যক মহিলার সমাগম ঘটেছিল। বাসন্তী দেবীর সঙ্গে উর্মিলা দেবীও স্বরাজ-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি স্বরাজ-আন্দোলনের আদর্শ ও মূলমন্ত্র প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। চরকার বহুল ব্যবহার এবং বিশেষত মহিলাদের মধ্যে চরকাকে জনপ্রিয় করে তুলতে তাঁর উদ্যোগ-আয়োজনের অন্ত ছিল না। ১৯২১ সালে 'নারী কর্ম মন্দির' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই নারী কর্ম মন্দিরের কর্মসূচিকে বাস্তবে রূপায়িত করার ব্যাপারে তিনি আন্তরিক ছিলেন।

হেমপ্রভা মজুমদার : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে হেমপ্রভা মজুমদার একটি উল্লেখযোগ্য নাম। চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্য পার্টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রাক্কালে পাঁচ জন সদস্য ছিলেন। হেমপ্রভা মজুমদার তাঁদের মধ্যে একজন। ১৯২৩ সালে বোম্বাই শহরে স্বরাজ্য পার্টির জেনারেল কাউন্সিল মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে হেমপ্রভা মজুমদারও এই মিটিং-এ যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ১৯৩৭ সালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। 'নারী কর্ম মন্দির' পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন উর্মিলা দেবী। উর্মিলা দেবীকে এই কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন হেমপ্রভা মজুমদার। অনতিবিলম্বে নারী কর্ম মন্দির বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২২ সালে হেমপ্রভা মজুমদারের উদ্যোগে গঠিত হয় 'মহিলা কর্মী সংসদ'। এই কর্মী সংসদের মাধ্যমে মহিলাদের জাতীয়তাবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত করার সঙ্গে সঙ্গে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ মহিলা কর্মী সংসদের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি ছিল দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য হল রাজনীতিক ও সামাজিক। ১৯২১ সালে গোয়ালন্দ ও চাঁদপুরে স্টিমার ধর্মঘট হয়। এই ধর্মঘটে হেমপ্রভা মজুমদার সক্রিয়ভাবে নেতৃত্বমূলক ভূমিকা গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি নারায়ণগঞ্জে যান এবং সেখানে তিনি একটি মহিলা সংগঠন গড়ে তোলেন। ইতিহাসবিদদের অভিমত অনুযায়ী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং নারী মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে সংযোগ সাধনের ক্ষেত্রে দু'জন বিশিষ্ট মহিলা রাজনীতিকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দু'জন মহিলা রাজনীতিক হলেন হেমপ্রভা মজুমদার ও সরোজিনী নাইডু। ১৯২৬ সালে সরোজিনী কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। এই সময় সরোজিনীর সঙ্গে হেমপ্রভা সর্বপ্রকারে সাহায্য-সহযোগিতা করেন।

জ্যোতির্ময়ী দেবী : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সরোজিনী নাইডু ও হেমপ্রভা মজুমদারের সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বাঙালি মহিলা রাজনীতিকের নাম শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণীয়। ইনি হলেন জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি। এই মহিলা রাজনীতিকরা ভারতে বিশেষত বাঙলায় ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মহিলাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে শামিল করেছেন। পরিবার-পরিজন থাকা সত্ত্বেও যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে শামিল হওয়া যায় সে বিষয়ে এই মহিলা রাজনীতিকরা নিজেদের দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রতিপন্ন করেছেন। এঁদের আত্মত্যাগ ও উজ্জীবিত ভূমিকা দেশ ও দেশবাসীর কাজে অংশগ্রহণের ব্যাপারে নারী সমাজে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া ভারতের জাতীয় কংগ্রেসও মহিলা রাজনীতিকদের বলিষ্ঠ ভূমিকার দ্বারা অধিকতর সমৃদ্ধ হয়েছে। জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি শিক্ষকতা করতেন সিংহলে। মহাত্মা গান্ধির অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে শিক্ষকতা ছেড়ে তিনি দেশে ফিরেছিলেন। দেশবাসীর মধ্যে তিনি 'দেবীচৌধুরাণী' নামে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। কলকাতা কংগ্রেসে (১৯২০) এই মহিলা রাজনীতিকই সর্বপ্রথম একটি 'নারী স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী' গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে আইন অমান্য আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। মূলত মহিলাদের দ্বারাই কলকাতায় আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে।

লীলা রায় ও আশালতা সেন : স্বাধীনতা সংগ্রামে শামিল মহিলাদের মধ্যে লীলা রায়ের নাম করা দরকার। এই বিদুষী মহিলা নারী শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তারের ব্যাপারে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে

ক্ষণ্যে তিনি ঢাকায় ১৯২৪ সালে 'দীপালি সংঘ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। লীলা রায়ের একজন একনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন। তাঁর নাম রেণুকা সেন। রেণুকা সেন কলকাতায় দীপালি সংঘের একটি শাখা সংগঠন গড়ে তোলেন। তাছাড়া তিনি ছাত্রীদের থাকার জন্য একটি ছাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠা করেন। যাই হোক দীপালি সংঘ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে লীলা রায়ের মূল লক্ষ্য ছিল বিপ্লবী আদর্শে মেয়েদের অনুপ্রাণিত করা। আশালতা সেন ঢাকায় 'গান্ডারিয়া মহিলা সমিতি' গঠন করেন এবং মহিলাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা প্রচারের ব্যাপারে উদ্যোগী হন।

সন্তোষকুমারী ও প্রভাবতী দেবী : স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিক নেত্রী হিসাবে সন্তোষকুমারী গুপ্ত এবং প্রভাবতী দাশগুপ্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উভয়েই ছিলেন সমকালীন শ্রমিক সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল মহিলা নেত্রী। তারকেশ্বরে ১৯২৩ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সংগঠিত হয়। এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সন্তোষকুমারী নেতৃত্ব দিয়েছেন। পরবর্তীকালে চটকল শ্রমিকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তিনি আন্তরিকভাবে উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেন। এবং অনতিবিলম্বে তিনি মহিলা শ্রমিক নেত্রী হিসাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। সমকালীন আর একজন বিশিষ্ট মহিলা শ্রমিক নেত্রীর নাম হল প্রভাবতী দাশগুপ্ত। প্রভাবতী দেবী 'ধাঙড় মা' নামে বিশেষভাবে পরিচিত। কারণ তিনি ১৯২৮ সালে হাওড়া ও কলকাতায় ধাঙড়দের ধর্মঘট সংগঠিত করেন। আবার ওই সময় চটকল ধর্মঘট সংগঠিত করার ক্ষেত্রেও তিনি সাধ্যমতো উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেন।

আন্দোলনে ছাত্রীদের যোগদান : মহিলাদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসুর মতাদর্শকে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং জাতীয়তাবাদী আদর্শে মহিলাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য ১৯২৭ সালে 'মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘ' গড়ে তোলা হয়। সুভাষচন্দ্র বসুর মা প্রভাবতী বসু এই সংগঠনটির সভানেত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘের সম্পাদিকা ও সহ-সম্পাদিকা হিসাবে কাজ করেছেন যথাক্রমে লতিকা ঘোষ এবং অরুবালা সেনগুপ্ত। লতিকা ঘোষ ১৯২৮ সালে একটি স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গড়ে তোলেন। এই বাহিনীতে বিভিন্ন কলেজের প্রায় দু'শো জন কলেজ ছাত্রী সক্রিয় সদস্যা হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধি যখন কলকাতায় আসেন তখন তাঁর সভায় বিভিন্ন কলেজের অনেক ছাত্রী এসেছিলেন। এক্ষেত্রে 'ডায়াশেসন'-এর ছাত্রীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধীরে ধীরে ছাত্রীরা আন্দোলনে যোগ দিতে এগিয়ে এলেন। ভারতীয় তথা বাঙালি মেয়েদের সাবেকি নারীসুলভ রক্ষণশীল জীবনযাত্রার শৃঙ্খলসমূহ আলগা হয়ে যেতে লাগল। ছাত্রীরাই অধিক সংখ্যায় পথসভা সংগঠিত করতে লাগল। চাঁদা সংগ্রহ, প্রচার, ধর্মঘট সংগঠিত করা প্রভৃতি কাজে কলেজের ছাত্রীরা ক্রমশ অধিক সংখ্যায় এগিয়ে আসতে লাগল।

ছাত্রীদের সংগঠন : স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ছাত্রী-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রীদের দুটি সমকালীন সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক। এই দুটি সংগঠন হল 'দীপালি সংঘ' এবং 'ছাত্রী সংঘ'। এই দুটি সংগঠনের মধ্যে গভীর যোগাযোগ ছিল। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে ঢাকায় দীপালি সংঘের সৃষ্টি হয়। মহিলাদের এই সংগঠনটির একটি স্বতন্ত্র ছাত্রী-শাখা ছিল। এই ছাত্রী শাখাটির কর্মসূচি ছিল বহুমুখী। প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তারের ক্ষেত্রে এই সংগঠনটি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাছাড়া মহিলাদের বিবিধ সামাজিক অধিকারের সমর্থনে জনমত সৃষ্টির জন্য এই সংঘ বিতর্ক ও আলোচনা সভার আয়োজন করত। আবার মহিলাদের আত্মরক্ষামূলক বিবিধ কলাকৌশল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও এই সংঘ করত। ১৯২৮ সালে কলকাতায় ছাত্রীদের এ রকম একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনটি 'ছাত্রী সংঘ' নামে পরিচিত। বিভিন্ন বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এর সদস্য হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে বেথুন স্কুল ও কলেজ, ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছাত্রী সংঘের সদস্যদের বিভিন্ন শারীরিক শিক্ষা ও আত্মরক্ষামূলক কলাকৌশলের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। সুরমা মিত্র ছিলেন এই সংঘের সভানেত্রী এবং কল্যাণী ভট্টাচার্য সম্পাদিকা। ছাত্রী সংঘের সদস্যদের থাকার জন্য একটি ছাত্রীনিবাসও ছিল। ছাত্রী সংঘের সদস্যদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের দায়িত্ব পালন করেছেন একজন সমকালীন বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতা। ইনি হলেন দীনেশ মজুমদার।

দীপালি সংঘ ও ছাত্রী সংঘের সদস্যাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা হলেন বীণা দাস, কমলা দাসগুপ্তা, কল্পনা দত্ত, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রমুখ। বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের বিভিন্ন বিপ্লবী কর্মসূচিতে এঁরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। সমকালীন ভারতের এই সমস্ত মহিলা বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড বেশ কিছু তরুণীকে জাতীয়তাবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছিল; স্বদেশ ও স্বজনের প্রতি ভালোবাসায় উজ্জীবিত করেছিল। ভারতব্যাপী গড়ে উঠেছিল স্বাধীনচেতা ও দৃঢ় মানসিকতার একদল মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামী। প্রমাণিত রয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নারী-শক্তি পুরুষ-শক্তির তুলনায় হীন নয়।

বিশিষ্ট মহিলা বিপ্লবী রাজনীতিক : স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে বিপ্লবী মহিলা রাজনীতিক ও প্রক্রিয় কর্মীদের অনুপ্রাণিত জাতীয়তাবাদী আচরণ ব্রিটিশ সরকারকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার যে বিপাকে পড়েছিল তা কলকাতা পুলিশের সমকালীন কমিশনার ক্লার্ক-এর প্রতিবেদন থেকে প্রতিপন্ন হয়। এই প্রতিবেদনে সমকালীন বেশকিছু মহিলা রাজনীতিকের নাম আছে। এঁদের রাজনীতিক কর্মকাণ্ড ইংরেজ পুলিশ বাহিনী ও সমগ্র সরকারি ব্যবস্থাকে বিহ্বল করে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিয়েছিল। এই সমস্ত স্বনামধন্যা বাঙালি মহিলা বিপ্লবীরা হলেন বাসন্তী দেবী, ঊর্মিলা দেবী, হেমপ্রভা মজুমদার, সুনীতি দেবী, বীণাপাণি দেবী, প্রতিমা দেবী, সুনীতিবালা মিত্র, মোহিনী দাসগুপ্তা, বগলা সোম, সতী দেবী, উমা দেবী, মাতঙ্গিনী হাজরা প্রমুখ। পুলিশ কমিশনার ক্লার্কের প্রতিবেদন অনুযায়ী মহিলা বিপ্লবীদের অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্ম। এবং মহিলা স্বেচ্ছাসেবীরা প্রায়শই সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মিছিল ও জনসমাবেশ সংগঠিত করতেন। মহিলা রাজনীতিকদের কর্মকাণ্ড ব্রিটিশ সরকারের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শহর কলকাতার মতো গ্রামাঞ্চলের মহিলারাও স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের শামিল হয়েছিলেন। মেদিনীপুরের মহিলারা জেলা-শহরের ইউনিয়ন বোর্ড বয়কট আন্দোলনকে সফল করে তুলেছিলেন।

উপসংহার : পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী রাজনীতিক কর্মকাণ্ডে সংখ্য মহিলা অংশগ্রহণ করেছেন এবং অভাবনীয় আত্মত্যাগ করেছেন। এঁদের সকলের নাম স্বাধীনতা গ্রামের ইতিহাসে লেখা নেই এবং স্বাভাবিক কারণে তা লিপিবদ্ধ থাকা সম্ভবও ছিল না। বহু মহিলা স্বেচ্ছাসেবী বিপ্লবী ব্রিটিশ সরকারের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। পুরুষ শাসিত পরিবারের ধ্যে অসংখ্য অসামর্থ্যের জালে জড়িয়ে থাকা মহিলারা পরিবারের নিরাপদ আশ্রয়ের বাইরে বেরিয়ে এসেছেন এং স্বাধীনতা সংগ্রামের ঝান্ডা ধরে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনীর মুখোমুখি হয়েছেন। মুষ্টিমেয় নেতৃস্থানীয় মহিলা রাজনীতিকদের কথা বাদ দিলে বাকি সকলে বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁদের আত্মত্যাগ বিফলে যায়নি। মহিলাদের জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সমগ্র জাতির পিঠে চেতনার চাবুক চালিয়েছে; জাতির ধ্যে নতুন শক্তি ও উন্মাদনার সঞ্চার করেছে।

১৩.৭ নারীবাদের উদ্ভব ও বিকাশ (Origin and Development of Feminism)

নারীবাদের আবির্ভাব ঘটেছে বিংশ শতাব্দীতে। তবে বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে নারীবাদ সম্পর্কিত আলোচনা পরিচিতি পায় এবং বিকশিত হয়। আধুনিককাল নারী আন্দোলন এবং মহিলাদের সামাজিক ভূমিকার পরিধিকে প্রসারিত করা সম্পর্কিত উদ্যোগ আয়োজনের সঙ্গে নারীবাদ সম্পর্কিত। এ দিক থেকে বিচার করলে এই বনিয়াদি বিশ্বাসের সঙ্গে নারীবাদী ধারণা সংযুক্ত। এই দুটি বিশ্বাস হল : (ক) লিঙ্গগত কারণেই নারীজাতি অসুবিধাজনক অবস্থায় অবস্থিত; (খ) মহিলাদের অসুবিধার অবসান করা যায় এবং তা করা উচিত। নারীবাদীরা স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে রাজনীতিক সম্পর্কের ধারাকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, অধিকাংশ সমাজেই মহিলাদের অধীনতামূলক এবং পুরুষদের প্রাধান্যমূলক অবস্থান পরিলক্ষিত হয়।

নারীবাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যসূচক বিভিন্ন মতামত ও রাজনীতিক অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। নারী-

আন্দোলনসমূহের ক্ষেত্রে বিবিধ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পরিলক্ষিত হয়। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য হল : নারী ভোটাধিকার অর্জন, মহিলাদের পোশাক-পরিচ্ছদের উপর নিয়ম-নিষেধের শিথিলকরণ, শিক্ষার ক্ষেত্রে সমানাধিকার, সরকারি এলিট পদসমূহে মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি, গর্ভপাত বৈধকরণ প্রভৃতি। অনুরূপভাব আবার নারীবাদীরা আন্দোলনের সাফল্যের স্বার্থে সংস্কারমূলক ও বৈপ্লবিক—উভয় ধরনের রাজনীতিক কলাকৌশল অবলম্বন করে থাকেন। নারীবাদী মতবাদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনীতিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের আগে অবধি রাজনীতিক ক্ষেত্রে লিঙ্গাভেদমূলক আলোচনাকে আকর্ষক বা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়নি। সামাজিক, অর্থনীতিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে ভূমিকাগত পার্থক্যকে নিতান্তই স্বাভাবিক ও অপরিহার্য বলে বিবেচনা করা হত। সকল সমাজেই নারী-পুরুষের মধ্যে শারীরিক কারণে সাবেকি কিছু শ্রমবিভাজন ছিল সর্বজনস্বীকৃত ও স্বাভাবিক। মহিলারা ঘর-গৃহস্থালীর কাজকর্ম ও সন্তান প্রতিপালন করবে এবং পুরুষরা ঘরের বাইরের শ্রমসাধ্য কাজকর্ম সম্পাদন করবে—এই ছিল বরাবরের নারী-পুরুষের শ্রমবিভাজনের ধারা ও বিশ্বাস। সাবেকি রাজনীতিক মতবাদসমূহে এই বিশ্বাসই জায়গা করে নিয়েছে। প্রথাগত রাজনীতিক তত্ত্বসমূহে সাধারণভাবে লিঙ্গাভেদের বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। রাজনীতির তাত্ত্বিক আলোচনায় ঐতিহ্যগতভাবে লিঙ্গাগত পক্ষপাতিত্বের বিষয়টিকে নারীবাদে তুলে ধরা হয়েছে। দেখানো হয়েছে যে, পুরুষ চিন্তাবিদরা পুরুষানুক্রমে বিশেষাধিকার ও ক্ষমতা ভোগ করে আসছেন এবং রাজনীতিক কর্মসূচি থেকে মহিলাদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন।

'নারীবাদ' শব্দটি সাম্প্রতিককালের। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু প্রাচীনকালের গ্রিস ও চিনের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে নারীবাদী বক্তব্যের পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রিস্টান ডি পিসান (Christine de Pisan) প্রণীত *Book of the City of Ladies* শীর্ষক গ্রন্থটি ১৪০৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে অতীতের বহু বিশিষ্ট মহিলার স্মরণীয় কাজকর্মের বিবরণ আছে; আছে মহিলাদের শিক্ষার ও রাজনীতিক প্রভাবের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা। উল্লিখিত গ্রন্থটিতে আধুনিক নারীবাদের অনেক বক্তব্যেরই অভিব্যক্তি ঘটেছে। তবে সংগঠিত নারী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছে উনবিংশ শতাব্দীতে। আধুনিক নারীবাদ সম্পর্কিত প্রথম গ্রন্থ হিসাবে সাধারণত মেরী উলস্টোনক্রাফ্ট (Mary Wollstonecraft) প্রণীত *Vindication of the Rights of Women* (1792) শীর্ষক গ্রন্থটির কথা বলা হয়ে থাকে। ফরাসি বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থটি প্রণীত হয়েছে।

প্রথম পর্বের নারীবাদ (First Wave Feminism) : উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নারীবাদী আন্দোলন অধিকতর সংগঠিতভাবে অভিব্যক্তি লাভ করে। এই সময় ভোটাধিকারের সম্প্রসারণ নীতির পরিপ্রেক্ষিতে নারী-ভোটাধিকার সম্পর্কিত আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। মহিলাদের জন্য পুরুষদের সমান আইনগত ও রাজনীতিক অধিকারের দাবি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। নারী-ভোটাধিকার ছিল মুখ্য দাবি। কারণ মনে করা হয়েছিল যে, ভোটাধিকার ভোগের মাধ্যমে মহিলাদের উপর আরোপিত অসাম্য-বৈষম্যসূচক অসামর্থ্যসমূহ অচিরেই অপসারিত হবে। এই সময়টি 'প্রথম পর্বের নারীবাদ' (first wave feminism) হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে রাজনীতিক গণতন্ত্র ইতিমধ্যে বিকশিত হয়েছিল, সেই সমস্ত দেশে নারী আন্দোলন বিশেষভাবে শক্তিশালী হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে নারী আন্দোলনের সুসংগঠিত অভিব্যক্তি ঘটে। গ্রেট ব্রিটেনে উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে নারী আন্দোলন সংগঠিত হয়। ১৮৯৩ সালে প্রথম নিউজিল্যান্ডে মহিলাদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। এবং এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম পর্বের নারীবাদের সমাপ্তি ঘটে। গ্রেট ব্রিটেনে ১৯১৮ সালে মহিলাদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু পুরুষের সমান ভোটাধিকার পেতে যুক্তরাজ্যের মহিলাদের আরও এক দশক লেগে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২০ সালে মহিলাদের ভোটাধিকার স্বীকার করা হয়।

মার্কিন মুলুকে মহিলাদের ভোটাধিকারের আন্দোলন, কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ভোটাধিকারকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে National Women Suffrage Association গঠিত

য়। এই সংগঠনটি ভোটাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকল ক্ষেত্রেও পুরুষের সমানাধিকার দাবি করে। আর কটি অনুরূপ সংগঠন 'American Women Suffrage Association' প্রধানত ভোটাধিকারের দাবি-দাওয়া য়ে আন্দোলন সংগঠিত করে। আমেরিকার বাইরে, ফ্রান্স এবং কানাডাতেও নারীর ভোটাধিকারের আন্দোলন গঠিত হয়। এই পর্বের নারী আন্দোলনে ভোটাধিকার ব্যতীত আরও কতকগুলি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া : বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা করার অধিকার, পিতামাতার অনুমোদন ছাড়াই বিবাহ করার অধিকার, পুরুষের শে অভিন্ন সুযোগের অধিকার, কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সমানাধিকার, শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে মানাধিকার প্রভৃতি।

প্রথম পর্বের নারীবাদী বক্তব্যে কতকগুলি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি হল : মাজে নারীর সমানাধিকার অর্জন, নারীর অধস্তন অবস্থানের অবসান, নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য অপসারণ ভৃতি। আইনি-সাংবিধানিক অধিকার অর্জনের সংগ্রাম নারী-আন্দোলনের এই পর্বে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। মেরিকায় ন্যুইয়র্ক-এ *Married Women's Property Right* শীর্ষক আইন প্রণীত হয় ১৮৬০ সালে। মার্কিন হিলারা ভোটাধিকার পায় ১৯২০ সালে। এর বছর দু-এক আগেই ১৯১৮ সালে যুক্তরাজ্যে (UK) মহিলাদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে মহিলাদের ভোটাধিকার স্বীকার করা হয় উনবিংশ তাব্দীর শেষের দিকে।

দ্বিতীয় পর্বের নারীবাদ (Second Wave Feminism) : নারীজাতির ভোটাধিকারের স্বীকৃতি রী-আন্দোলনকে কার্যত দুর্বল করে দেয়। নারী ভোটাধিকার আদায় সম্পর্কিত দাবি নারীজাতির মধ্যে এক নের সংহতি ও উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে নারী-আন্দোলন সংগঠিত ও পরিচালিত য়েছিল। নারী-ভোটাধিকার স্বীকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়াকারীদের মধ্যে এক ধরনের আত্মতুষ্টির ভাব রিলক্ষিত হয়। তারা ধরে নেন যে মহিলাদের ভোটাধিকারই নারীজাতির সামগ্রিক মুক্তিকে সুনিশ্চিত করবে। রপর বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে নারী আন্দোলনের পুনরুত্থান পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ নারী আন্দোলনের ত্রে আর একটি অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটে। এই অধ্যায়টিকে বলা হয় 'দ্বিতীয় পর্বের নারীবাদ' (second wave minism)। কালক্রমে জৈবিক লিঙ্গের থেকে সামাজিক লিঙ্গের স্বাতন্ত্র্য, পিতৃতান্ত্রিকতা প্রভৃতি ধারণাসমূহের বির্ভাব ঘটে এবং সূত্রপাত ঘটে নারীবাদের দ্বিতীয় পর্বের।

দ্বিতীয় পর্বের নারীবাদের মাধ্যমে এই বক্তব্যটির অভিব্যক্তি ঘটে যে, আইনানুগ ও রাজনীতিক অধিকার-মূহের স্বীকৃতির মাধ্যমে নারীজাতির সমস্যাসমূহের সম্যক সমাধান সম্ভব নয়। এই পর্বে নারীবাদের ধ্যান-ধারণা যুক্তিসমূহ ক্রমান্বয়ে অধিকতর প্রগতিশীল ও র‍্যাডিক্যাল (radical) হয়ে পড়তে থাকে। অনেক সময় নারীবাদীরা প্লবিক হয়ে পড়েন। দ্বিতীয় পর্বের নারীবাদের উদ্দেশ্য মহিলাদের রাজনীতিক মুক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই র্বে নারী মুক্তি আন্দোলন এক সামগ্রিক প্রকৃতিপ্রাপ্ত হয়। সামগ্রিক বিচারে নারী-স্বাধীনতা শুধুমাত্র রাজনীতিক ও ইনগত পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে সম্ভব নয়। এই কারণে আধুনিক নারীবাদীরা অভিপ্রেত সামাজিক পরিবর্তন ধনের ক্ষেত্রে র‍্যাডিক্যাল (radical) বা বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া অনুসরণের পক্ষপাতী। বেটি ফ্রিডান (Betty Friedan) ণীত বিখ্যাত গ্রন্থ *The Feminine Mystique* প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে। এই গ্রন্থটি নারীবাদী চিন্তাভাবনার বির্বিকাশের ক্ষেত্রে সদর্থক ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। গৃহবধূ ও জননীর ভূমিকার মধ্যে মহিলাদের সীমাবদ্ধ জনিত হতাশা ও অসন্তোষ বইটিতে সন্তোষজনকভাবে ব্যক্ত হয়। এই প্রসঙ্গে ১৯৭০ সালে প্রকাশিত দুটি ন্থের নাম করা দরকার। একটি হল জারমেইন গ্রীর (Germaine Greer) প্রণীত *The Female Eunuch* বং অন্যটি হল মিল্লেৎ (Kate Mallett) প্রণীত *Sexual Politics*। এই সমস্ত আলোচনায় নারী-নির্যাতনের ক্তিগত, মনস্তাত্ত্বিক ও যৌন সমস্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

নিজের অধিকারের দাবিতে নারীবাদ একটি মতাদর্শ হিসাবে মর্যাদা পেতে পারে এ বিষয় বিংশ-তাব্দীর ষাটের দশক অবধি অনেকাংশেই অস্বীকৃত ছিল। সমকালীন চিন্তাজগতে নারীবাদকে বহুলাংশে রাজনীতিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের উপ-ধারণা হিসাবে গণ্য করা হত। লিঙ্গভিত্তিক বিষয়াদিতে

উদারনীতিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের মতাদর্শ ও মৌলিক মূল্যবোধের প্রয়োগই নারীবাদী বক্তব্য হিসাবে বিবেচিত হত। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদের (radical feminism) উদ্ভবের ফলে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা লিঙ্গগত বিভেদের বিষয়টির কেন্দ্রীয় রাজনীতিক গুরুত্বের কথাটি ঘোষণা করেন। সাবেকি রাজনীতিক মতাদর্শগুলিতে এই বক্তব্যের স্বীকৃতি ছিল না। নারীজাতির সামাজিক ভূমিকাকে অগ্রবর্তী করার ব্যাপারে ঐতিহ্যগত রাজনীতিক মতবাদগুলিকে সহায়ক বা উপযোগী বলে মনে করা হয়নি। বরং অনেক ক্ষেত্রেই প্রথাগত রাজনীতিক মতবাদগুলিকে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণার পরিপোষক বা সহায়ক হিসাবে সমালোচনা করা হয়।

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে মার্কিন মুলুকের কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী ও রাজনীতি, নারীর কর্মসংস্থান, নারীর স্বাস্থ্য ও মনস্তত্ত্ব, নারীর ইতিহাস ও সাহিত্য প্রভৃতি নারীবাদ বিষয়ক কাজ আরম্ভ হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা আবশ্যক যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশনের আওতায় ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছিল Subcommittee on the Status of Women (CSW)। কালক্রমে বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে CSW-এর মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। ভারতে ড. ফুলরেণু গুহ-র নেতৃত্বে CSW গঠিত হয়। এই শতাব্দীর ষাট ও সত্তরের দশকে মহিলাদের অধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কিত বেশ কিছু আইন আমেরিকায় প্রণীত হয়। যেমন Equality Pay Act, 1963, Civil Rights Act, 1964; Affirmative Action, 1967 প্রভৃতি। দ্বিতীয় পর্বের নারীবাদী আন্দোলন ব্রিটেনেও সংগঠিত হয় প্রধানত আর্থনীতিক স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়াদির ভিত্তিতে। সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সমমজুরি সম্পর্কিত আন্দোলন। কল-কারখানায় ধর্মঘট, পারিবারিক, সাংস্কৃতিক ও যৌন জীবনে মহিলাদের স্বাধীনতা প্রভৃতি। ব্রিটেনের দ্বিতীয় পর্বের নারীবাদী আন্দোলনে উপরিউক্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। দ্বিতীয় পর্বের নারীবাদী আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার অধিকাংশই স্বীকৃতি লাভ করেছিল। স্বভাবতই বিংশ শতাব্দীর আশির দশকের গোড়ার দিকেই দ্বিতীয় পর্বের নারীবাদী আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়তে থাকে।

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষের দিকে এবং সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে নারীবাদী চিন্তা-ভাবনা অনেকাংশে র‍্যাডিক্যাল (radical) হয়ে পড়ে। এই সময় নারীবাদ স্বতন্ত্র একটি মতাদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথাগত রাজনীতিক চিন্তাধারার বিরুদ্ধে নারীবাদী ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধ প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। জনজীবন সম্পর্কিত বিষয়াদিতে সাধারণভাবে লিঙ্গগত সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে নারীবাদ ইতিমধ্যে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। তাছাড়া বিভিন্ন বৌদ্ধিক আলোচনার পটভূমি হিসাবে নারীবাদ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিংশ শতাব্দীর শেষের দশকে সকল পশ্চিমী দেশে এবং উন্নতশীল বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলে নারীবাদী সংগঠনসমূহের সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটেছে।

তৃতীয় পর্বের নারীবাদী (Third Wave Feminism) : বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এসে নারীবাদী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে দ্বিবিধ প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে নারীবাদ ছিল বহুলাংশে অসমঝোতামূলক ও র‍্যাডিক্যাল প্রকৃতির। কিন্তু দুটি দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পর নারীবাদী ক্রিয়াকলাপে র‍্যাডিক্যাল প্রকৃতির অবসান ঘটে। নারীবাদের মধ্যে সমঝোতামূলক প্রক্রিয়া ও প্রবণতার সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে 'উত্তর-নারীবাদ' (post-feminism) সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণার সৃষ্টি হয় এবং তা জনপ্রিয় হতে থাকে। অধুনা এই ধারণা বিশেষভাবে জনপ্রিয় যে, নারীবাদী উদ্দেশ্যসমূহ বহুলাংশে সফল হয়েছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি পরিমণ্ডলে নারী আন্দোলন নারীবাদকে অতিক্রম করে গেছে।

অধুনা নারীবাদী ধারায় দ্বিতীয় একটি প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। এই প্রক্রিয়াটিকে খণ্ডীকরণ প্রক্রিয়া হিসাবে অভিহিত করা যায়। নারীবাদী চিন্তা-ভাবনা ইতিমধ্যে র‍্যাডিক্যাল বহুরূপায়ণের প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। তার ফলে নারীবাদী চিন্তা-ভাবনার ভিতরে অভিন্ন যুক্তিবাদকে চিহ্নিত করা দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারীবাদের মূলগত ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গে নারীবাদী অন্যান্য ধারার সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য হল : উদারনীতিক, সমাজতান্ত্রিক বা মার্কসবাদী ও র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ। এদের সঙ্গে অধুনা সংযুক্ত

হয়েছে উত্তর-আধুনিক নারীবাদ, কৃষ্ণ নারীবাদ (black feminism), মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক নারীবাদ, সমকামী নারীবাদ প্রভৃতি।

বিংশ শতাব্দীর নব্বই-এর দশকের গোড়ার দিকে তৃতীয় পর্বের নারীবাদের সূত্রপাত ঘটে। এই পর্বের নারীবাদ কতকগুলি বিষয় সূত্রে মতাদর্শগত উপাদান আহরণ করে থাকে। সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলি হল : উত্তর আধুনিকতাবাদ, উত্তর-উপনিবেশবাদী ধারণা, বিকল্প যৌনতার ধারণা, পরিবেশমূলক ধারণা, সমাজোচনামূলক ধারণা, অজাবর্ণমূলক গোষ্ঠীগত ধারণার বিরোধিতা প্রভৃতি। এই পর্বের আগে থেকেই মার্কিন মুলুকের বেশকিছু কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদী অনুধাবন করেন যে, পূর্ববর্তী পর্বের নারীবাদে শিক্ষিত ও শ্বেতাঙ্গ এবং উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মহিলাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নারী জাতির সমস্যাদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের সমস্যাদি ও অভিজ্ঞতাকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

তৃতীয় পর্বের নারীবাদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। (ক) নারীজাতিকে একটি সমধর্মীয় বর্গ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রসমূহে নারীজাতির অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। (খ) সমধর্মীয় বর্গ নয় বলেই, বিভিন্ন বর্গের মহিলাদের সমস্যাদির ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য স্বাভাবিক। (গ) প্রত্যেক প্রকারের বা বর্গের মহিলাদের সমস্যাদি ও অভিজ্ঞতাসমূহ নারীবাদী ধারণার অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক। (ঘ) এই পর্বের নারীবাদে তৃতীয় লিঙ্গ বা বিকল্প যৌনতাকে স্বীকার করা হয়। (ঙ) বৃহত্তর বিশ্বজনীন ও সর্বজনস্বীকৃত নারীবাদী ধারণার পরিবর্তে, আঞ্চলিক অভিজ্ঞতা, বৈশিষ্ট্য ও সমস্যাদির উপর জোর দেওয়া হয়। (চ) নারীদেহ, যৌনতা বা যৌনকর্ম প্রভৃতি প্রসঙ্গে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা হয়। এ সবকে নারীর ক্ষমতায়নের হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করা হয়। (ছ) নারীশক্তি (Girl power)-কে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। আকর্ষণীয় নারীদেহ ও নারীত্ব নারী ক্ষমতার উৎস হিসাবে পরিগণিত হয়। এর থেকেই উত্তর-নারীবাদী ধারণার সূত্রপাত ঘটে।

কালগত বিচারে তৃতীয় পর্বের নারীবাদ এবং উত্তর-নারীবাদ এক মনে হতে পারে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয় পর্বের নারীবাদের মতানুসারে উত্তরনারীবাদ দ্বিতীয় পর্বের নারীবাদের বিরূপ সমালোচনা করলেও পিতৃতান্ত্রিকতার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এই পর্বের নারীবাদ পূর্ববর্তী দ্বিতীয় পর্বের নারীবাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নারীবাদী ধ্যান-ধারণাকে অধিকতর বিস্তারিত, সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ করে। আবার তৃতীয় পর্বের নারীবাদের নারীক্ষমতা সম্পর্কিত ধারণা তীব্র বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। সমালোচকদের অভিমত অনুযায়ী সমৃদ্ধ পুঁজিবাদী ও নয়া উদারনীতিবাদী ব্যবস্থায় নারীদেহকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করা হয়। তবে তৃতীয় পর্বের নারীবাদী বক্তব্য অনেক বেশি সমৃদ্ধ। বস্তুত নারীবাদ হল সমগ্র বিশ্বের একটি মতবাদ ও আন্দোলন। একে এভাবে পৃথক পৃথক পর্বে বিভাজন সর্বাংশে সমীচীন নয়।

চতুর্থ পর্বের নারীবাদ (Fourth Wave Feminism) : সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকের অভিমত অনুযায়ী সাম্প্রতিককালে মার্কিন মুলুকে নারীবাদের একটি চতুর্থ পর্বের সূত্রপাত ঘটেছে। অতি উন্নত আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে বিশ্বব্যাপী নারীজাতির মধ্যে গভীর সংযোগ-সম্পর্ক গড়ে উঠছে। বিভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতির মহিলারা ন্যায় ও বিশ্বশান্তির জন্য সংঘবদ্ধ হচ্ছে। সামাজিক ন্যায় ও আধ্যাত্মিকতার উপাদান এই নারীবাদকে সমৃদ্ধ করেছে ও স্বকীয়তা দিয়েছে। এই নারীবাদের মধ্যে প্রতিবাদী প্রকৃতির পরিবর্তে সুখ-শান্তির প্রয়াস-প্রক্রিয়া অধিক। সামগ্রিক বিচারে নারীজাতির সমষ্টিগত গুরুত্ব এখানে অধিক।

১৩.৮ স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে নারী (Women in Independent India)

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে নারীজাতির সুদীর্ঘকালের দুরবস্থার অবসান ঘটেছে,

এমন দাবি করা যায় না। পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের পরিবর্তন ঘটেনি এমন নয়। বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে এবং এমন কি পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকেও মহিলাদের মর্যাদাগত অবস্থান ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। সমাজজীবনে মহিলাদের অবনমিত অবস্থানের কারণ হিসাবে কতকগুলি বিষয়ের কথা বলা হয়। বলা হয় যে, আর্থনীতিক ক্ষেত্রে নির্ভরশীলতা, নিরক্ষরতা, ধর্মীয় নিয়ম-নিষেধ, জাতিগত নিয়ন্ত্রণ, পুরুষের উদাসীনতা এবং নারী-নেতৃত্বের অভাবের কারণে সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের মর্যাদাগত অবস্থানের উন্নতি ঘটেনি। মহিলাদের জীবনধারার উপর বিভিন্ন পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। নারীজাতিকে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতিসমূহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : সামাজিক কাঠামো, সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক ভূমিকা বণ্টন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি। সমাজব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন শক্তির অবিরাম মিথস্ক্রিয়ার ফলে সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রায়শই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। সংশ্লিষ্ট শক্তিসমূহ হল ঐতিহাসিক, সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক। শ্যামাচরণ দুবে (S.C. Dube) তাঁর *Indian Society* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেছেন : "The manner in which these controls are exercised depend to a great extent on social structure, role allocation, value premises and the rigidity or flexibility of social control. The interplay of historical, economic, social and political forces contribute significantly to the shaping and reshaping of gender equations."

সমকালীন ভারতের সমাজব্যবস্থায় নারীজাতির মর্যাদাগত অবস্থানের হীনতার জন্য কতকগুলি বিষয়কে সাধারণভাবে দায়ী করা হয়। এই বিষয়গুলি হল : হিন্দু ধর্ম, জাতিভেদ ব্যবস্থা, পিতৃতান্ত্রিক হিন্দু যৌথ পরিবার ব্যবস্থা, মুসলমান শাসন প্রভৃতি।

সনাতন হিন্দু ধর্মের কতকগুলি বিশেষ মূল্যবোধ বর্তমান। হিন্দুধর্মের মূল্যবোধ এবং বিধি-ব্যবস্থা অনুযায়ী পুরুষের অবস্থান নারীর ঊর্ধ্বে। তাছাড়া সনাতন হিন্দুধর্মীয় নিয়মনীতি অনুসারে নারী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক ভূমিকা বণ্টিত হয়। অর্থাৎ ধর্মীয় রীতিনীতি মোতাবেক হিন্দু নারী ও পুরুষের মধ্যে ভূমিকাগত পার্থক্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মাতার ভূমিকা এবং গৃহকর্মে মহিলাদের ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলা হয়। বিপরীতক্রমে বলা হয় যে, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে পুরুষদের ভূমিকা প্রসারিত হবে। শাস্ত্রীয় বিধি-ব্যবস্থা অনুযায়ী সমগ্র জীবনব্যাপী হিন্দু মহিলাদের পুরুষের উপর নির্ভরশীল জীবন যাপন করতে হয়।

হিন্দু সমাজব্যবস্থায় নারীর অবনমিত অবস্থানের জন্য জাতপাতের ব্যবস্থাকে বহুলাংশে দায়ী করা যায়। জাতিগত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী বালিকা বিবাহের কথা বলা হয় এবং বিধবা বিবাহকে নিষিদ্ধ করা হয়। অক্ষুণ্ণ বার প্রয়াত স্বামীর চিতায় সদ্য বিধবার সহমরণের ব্যবস্থার ব্যাপারেও জাতিভেদ ব্যবস্থাকে দায়ী করা যায়। প্রকাশ্য জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণকে আটকানোর জন্য জাতি-ব্যবস্থার মাধ্যমে বিবিধ নিয়ম-নিষেধ আরোপ করা হয়। জাতিভেদ ব্যবস্থার সামগ্রিক প্রতিক্রিয়ার পরিণামে সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের মর্যাদাগত অবস্থান অবনমিত হয়।

ভারতীয় সমাজে পরিবার ব্যবস্থা ছিল পিতৃতান্ত্রিক। আবার সাংগঠনিক বিচারে পরিবার হল যৌথ পরিবার। পিতৃতান্ত্রিক হিন্দু যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় মহিলাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বলতে কার্যত কিছু থাকে না। এ ধরনের পরিবার ব্যবস্থায় বয়স, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও নারী-পুরুষ বিচারে মর্যাদাগত অবস্থান নির্ধারিত হয়। তার ফলে মহিলাদের মর্যাদা ও স্বাধীনতার অবক্ষয় অবধারিত হয়ে পড়ে।

সমাজবিজ্ঞানীদের অনেকের অভিমত অনুযায়ী ভারতে মধ্যযুগের মুসলমানও হিন্দু সমাজে নারীর মর্যাদার অবক্ষয়ের জন্য অনেকাংশে দায়ী। সুদীর্ঘ মুসলমান শাসনকালে হিন্দু মহিলাদের মর্যাদাগত অবস্থানের আর এক দফা অবক্ষয় ঘটেছে। ঐশ্লামিক প্রশাসনের প্রভাব প্রতিক্রিয়ার পরিণামে সামাজিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। জনজীবন থেকে মহিলাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার ব্যাপারে মুসলমানদের পর্দাপ্রথার মতো আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি হিন্দু সমাজের উচ্চবর্গের জাতি-গোষ্ঠীগুলি গ্রহণ করে। পর্দাপ্রথা নারীজাতির বিচ্ছিন্নতাকে বাড়িয়ে দেয় এবং স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাকে অধিকতর বিপন্ন করে তোলে। নারী-পুরুষের মধ্যে

পার্থক্যের ভিত্তিতে পরস্পরের পরিপূরক ভূমিকাগত বিভাজনের সৃষ্টি হয়। আবার মুসলমান আমলে ভারতের হিন্দু সমাজব্যবস্থায় শিশুকন্যা বিবাহের ব্যাপক প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। মুসলমান শাসক ও আমীর-ওমরাহদের কুনজর থেকে কন্যাসন্তানদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে হিন্দু পিতামাতারা শিশুকন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করা বিধেয় বলে মনে করে।

১৩.৯ বর্তমান ভারতীয় সমাজে নারী (Women in Modern Indian Society)

স্বাধীন ভারতে সামগ্রিক সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়টিকে অস্বীকার করা যায় না। এই পরিবর্তনের প্রভাব স্বাভাবিকভাবে মহিলাদের জীবনধারায়ও পরিলক্ষিত হয়। এই সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সূত্রপাত অল্প-বিস্তর ব্রিটিশ আমলেই দেখা গেছে। ইংরেজ শাসকরা প্রথমে ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না করার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের পরিবর্তন ঘটে। সমকালীন ভারতে, বিশেষত বাংলায় কয়েকজন দৃঢ়চেতা বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক নির্যাতিত মহিলাদের করুণ অবস্থার সংস্কার সাধনের ব্যাপারে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হন। পুরুষ সমাজ সংস্কারকদের এই উদ্যোগের সুবাদে মহিলাদের বিভিন্ন আন্দোলন সংগঠিত হয়। ব্রিটিশ সরকার বিবিধ সংস্কারমূলক দাবি-দাওয়াকে কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে। বিদ্যমান বিবাহ ব্যবস্থা, উত্তরাধিকার আইন প্রভৃতি ক্ষেত্রে মহিলাদের স্বার্থ ছিল চূড়ান্তভাবে অবহেলিত বা উপেক্ষিত। এ রকম অবস্থায় বিদ্যমান কিছু কিছু ব্যবস্থার অবসান এবং কিছু কিছু ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে স্বাধীন ভারতে আইন প্রণীত হয়। সংস্কারমূলক এই সমস্ত আইন ছাড়াও শিল্পায়ন, নগরায়ণ, পশ্চিমীকরণ, আধুনিকীকরণ, সংস্কৃতায়ন প্রভৃতি প্রক্রিয়ার প্রভাবে সামগ্রিক সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এবং এই সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই নারীজাতির জীবনধারায় পড়েছে। একথা অস্বীকার করা যাবে না। কতকগুলি ক্ষেত্রে পরিবর্তন মহিলাদের মর্যাদাগত অবস্থানের দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এতদ্‌সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় সাবেকি পিতৃকর্তৃত্বমূলক মানসিকতার পিছুটান অস্বীকার করা যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের সমাজব্যবস্থায় এখনও নারী-পুরুষগত বিচারে সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিষয়টিকে নিতান্তই একটি স্বাভাবিক বিষয় হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় মহিলারা এখনও হল স্থায়ীভাবে পত্নী ও জননী। আবার মার্কসীয় সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার ধনবৈষম্যমূলক পরিকাঠামোয় মহিলাদের উপর শোষণ-পীড়নের কথা বলা হয়। আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে অসাম্য-বৈষম্য এই শোষণের সহায়ক পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করে।

বর্তমান ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারীজাতির মর্যাদাগত অবস্থান সম্পর্কে একাধিক গবেষণামূলক সমীক্ষা সম্পাদিত হয়েছে। এ বিষয়ে বহু বিদগ্ধ সমাজবিজ্ঞানীর প্রামাণ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কতকগুলি গ্রন্থের পর্যালোচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থগুলি হল : নীরা দেশাই-এর *Women in Modern India* (1957); বি. আর. নন্দ'র *The Indian Women : From Purdah to Modernity* (1976); এম. এন. শ্রীনিবাস-এর *The Changing Position of Indian Women* (1978) ; রাম আহুজার *Rights of Women : A Feminist Perspective* (1992) ; কমলা ভাসিন-এর *What is Patriarchy* (1993) এবং *Understanding Gender* (2000) প্রভৃতি। উল্লিখিত সমাজবিজ্ঞানীদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান ভারতে মহিলাদের মর্যাদাগত অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা যায়। এই আলোচনায় কতকগুলি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা আবশ্যক। আধুনিককালের রাজনীতিক সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় বলা হয় যে, ভারতীয় জনজীবনের আধুনিকীকরণের অন্যতম পরিমাপের অন্যতম উপায় হল সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের মর্যাদাগত অবস্থান নির্ধারণ করা। বর্তমান ভারতের সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থান সম্পর্কিত আলোচনা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থনীতিক, রাজনীতিক প্রভৃতি বিভিন্ন দিক থেকে অর্থবহ।

পরিবার ব্যবস্থা ও ভারতীয় নারী ঃ পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ও লিঙ্গ-বৈষম্য ঃ সামগ্রিক সামাজিক পরিবর্তন সত্ত্বেও ভারতের সমাজব্যবস্থায় নারী-পুরুষের মধ্যে অসাম্য-বৈষম্যের বিচারে সামাজিক স্তরবিন্যাস এখনও বর্তমান। এবং পরিবার ব্যবস্থার মধ্যেই নারী-পুরুষগত অসাম্য-বৈষম্যের সূত্রপাত ও বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে পরিবারকেই লিঙ্গ বৈষম্যের সূতিকাগার বলা যায়। পরিবারের পরিধির মধ্যেই নারী অবদমনের এবং পুরুষ-প্রাধান্যের ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটে। ভারতীয় পরিবার ব্যবস্থায় পিতৃকর্তৃত্বের দিক থেকে নারী-অবদমনের বিষয়টিকে একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয় হিসাব দেখা হয়। লিঙ্গ-স্তরবিন্যাস, পুরুষ-প্রাধান্য এবং নারী-অবদমন ভারতীয় সমাজ ও পরিবার ব্যবস্থার সাবেকি বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্য এখনও বহুলাংশে বর্তমান। ভারতীয় পরিবার আকৃতি-প্রকৃতিতে পিতৃতান্ত্রিক। দু-একটি ছোটোখাটো ব্যতিক্রম এখানে-ওখানে থাকলেও পরিবারের পিতৃতান্ত্রিক প্রকৃতি এখনও অব্যাহত। পরিবারের চৌহদ্দির মধ্যেই ছোটোবড়ো সকল সদস্যের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার সূত্রপাত, বিকাশ ও বিস্তার ঘটে। নারী-পুরুষের মধ্যে মর্যাদাগত অসাম্য-বৈষম্য পরিবারের মধ্যেই প্রবলভাবে বর্তমান থাকে। এবং সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা উত্তরপুরুষের মধ্যে প্রবাহিত ও সঞ্চারিত হয়। এইভাবে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় এক স্বাভাবিক ও সর্বজনগ্রাহ্য বিষয়ে পরিণত হয়। এবং এই পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার জন্যই লিঙ্গগত অসম মর্যাদার বিষয়টি অর্থবহ হয়ে ওঠে ও স্থায়িত্ব লাভ করে।

মেয়েদের উপর পারিবারিক নিয়ন্ত্রণের আধিক্য ঃ হিন্দু-পরিবার ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে মহিলাদের উপর নিয়ম-নিষেধ আরোপ করা হয়ে থাকে। মেয়েদের পবিত্রতা সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই কারণে ঋতুমতী হওয়ার আগে বা পরে পরেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে পিতামাতা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। হিন্দু পরিবারে মহিলাদের যৌনতার উপর নিয়ন্ত্রণ অবিদিত নয়। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যেই জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিও অন্তর্নিহিত আছে। পরিবারের কন্যাসন্তানের চলাফেরার উপর এবং মেলামেশার উপর এখনও কড়া নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। এ বিষয়ে মেয়েদের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা অতিমাত্রায় নিয়ন্ত্রিত। পরিবারের পুরুষ সদস্যরা যৌনসংযোগ-সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করে, মেয়েদের ক্ষেত্রে তা অভাবিত। ছেলের থেকে মেয়ের যৌনতাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কারণ প্রচলিত ধারণা অনুসারে বিশ্বাস করা হয় যে, অতি সহজেই মেয়েরা অপবিত্র হয়ে যায়। এবং পরিবারে কোনো মেয়ের ক্ষেত্রে এরকম কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটলে, মেয়ের পিতার পরিবারের ও পতির পরিবারের বদনাম হয়। তবে মেয়েদের উপর নিয়ন্ত্রণের আধিক্য সাধারণত উচ্চবর্গের এবং উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারেই অধিক দেখা দেয়; নিম্নবর্গের ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে মেয়েদের উপর এই নিয়ন্ত্রণ ততটা দেখা যায় না, কারণ পরিবারের জীবিকার সন্ধানে সমাজের নিচুতলার মহিলাদের রুজিরোজগারে বেরতে হয়; নানা কাজকর্মে যোগ দিতে হয়। স্বভাবতই ঘরে বসে থাকলে তাদের চলে না, ঘরের বাইরে তাদের যেতেই হয়।

পরিবারের মধ্যে নারী অবদমন ঃ নারী জাতির স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিবিধ আইনগত অধিকারকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। এরকম অধিকার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিও পাচ্ছে। এ কথা অস্বীকার করা যাবে না। এতদ্‌সত্ত্বেও পরিবারের মধ্যে মহিলারা নির্যাতনের শিকার হন। পরিবারের মধ্যে নারী নির্যাতন অনেক সময় অতিমাত্রায় নির্মম ও নিষ্ঠুর হয়ে দাঁড়ায়। পরিবারের মধ্যে নারী-নির্যাতন হল একটি পারিবারিক অপরাধ। এই পারিবারিক অপরাধ কমেছে এমন দাবি করা যায় না। নারীর প্রতি পরিবারের হিংস্র আচরণের ঘটনা আজও ঘটে এবং ভালো সংখ্যায় ঘটে। নারী নির্যাতনের কারণে নারী অবদমিত হয়। সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা সূত্রে অবহিত হওয়া যায় যে, এই নারী অবদমনের পিছনে নারীর দায়-দায়িত্ব মোটেই কম নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে অধিক। পরিবারের কিছু কিছু সদস্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রেষারেষির। এ রকম ক্ষেত্রেই নারী অবদমনের ঘটনা অধিক মাত্রায় ঘটতে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে পুত্রবধূর উপর শাশুড়ির এবং বউদির উপর ননদের অবদমনমূলক আচরণের কথা বলা যায়। অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রে মহিলারাই পিতৃতান্ত্রিক ও ভোগবাদী মানসিকতার ধারক ও বাহক হিসাবে ভূমিকা পালন করে। তার ফলে পরিবারের মধ্যে নারী অবদমনের ঘটনা ঘটতে থাকে। সমাজতাত্ত্বিকদের অনেকেই পরিবারের মধ্যে নারী অবদমনের এই বিষয়টিকে পরিবারের একটি অন্ধকারময়

...র হিসাবে অভিহিত করার পক্ষপাতী। বস্তুত নারী নির্যাতন বা নারী অবদমন হল একটি পারিবারিক অপরাধ।

গৃহবধূর উপর গার্হস্থ্য নির্যাতন ঃ নারী অবদমনের থেকে বধূ-নির্যাতনের বিষয়টিকে পৃথকভাবে ...লোচনা করা প্রয়োজন। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় পরিবারের মধ্যে বধূ নির্যাতনের ঘটনা আজকালও ঘটে ... এরকম ঘটনার সংখ্যা মোটেই অবহেলা করার মতো নয়। সর্বভারতীয় ইংরেজি সংবাদপত্র 'দি টেলিগ্রাফে' ...শিত একটি তথ্য অনুযায়ী ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে একুশ শতাংশ নির্যাতিত ...। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই নির্যাতন নিয়মিতভাবে ঘটে এবং স্বামীরাই সরাসরি স্ত্রীদের শারীরিকভাবে নির্যাতন ...থাকেন। টেলিগ্রাফ পত্রিকায় প্রকাশিত উপরিউক্ত তথ্যটির উৎস হল ভারতের পরিবারসমূহের মধ্যে বধূ ...র্যাতন সম্পর্কিত একটি সমীক্ষার প্রতিবেদন। সংশ্লিষ্ট সমীক্ষাটি সম্পাদিত হয়েছে আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ...ান সংস্থার দ্বারা। ভারতে বধূ নির্যাতনের ঘটনা সকল জাতি ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পরিবারগুলির মধ্যে ...লক্ষিত হয়। সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত নির্যাতিতা বধূদের অধিকাংশ নির্যাতনের কারণ হিসাবে যে সমস্ত বিষয়াদির ... বলেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : বরপণ প্রদানে বধূর পিতৃপক্ষের অসামর্থ্য; পতিগৃহের পরিজন ও ...জনদের সম্যকভাবে সম্মান প্রদর্শন না করা; রান্নার কাজে অবহেলা; সন্তান পরিচর্যায় গাফিলতি, অনুমতি ...ই ঘরের বাইরে যাওয়া প্রভৃতি। এ হল পিতৃতান্ত্রিক ও ভোগবাদী মানসিকতার ফল। অবাক হওয়ার বিষয় ... এই যে, নির্যাতিত বধূদের অধিকাংশই মনে করেন যে, এই সমস্ত অপরাধের কারণে বধূ নির্যাতন অন্যায় ...অস্বাভাবিক নয়। সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত বধূদের অধিকাংশই মনে করেন যে, নিজের স্ত্রীর উপর নির্যাতনের ...রিক অধিকার সকল স্বামীরই আছে। এটা কিছু অন্যায় নয়। বরং এ বিষয়ে বাইরের লোকের কাছে কিছু ...টাই অন্যায়। এই কারণে এবং পরিবারের মধ্যে এ নিয়ে অধিকতর অশান্তির আশঙ্কায় অধিকাংশ গৃহবধূ মুখ ...তে চান না। পারিবারিক নির্যাতনকে গৃহবধূরা স্বাভাবিকভাবেই স্বীকার করে নিচ্ছেন; প্রতিবাদ করা দূরের ..., নির্যাতিতা গৃহবধূদের অধিকাংশই বধূ-নির্যাতনকে অন্যায় বলে মনে করেন না। সমাজতাত্ত্বিকদের অভিমত ...য়ী ভারতের পরিবার ব্যবস্থায় গৃহবধূদের মধ্যে এই পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার প্রতি সমর্থন দারিদ্র্য ও ...ক্ষরতার সঙ্গে সম্পর্কিত। এবং এই সম্পর্ক ইতিবাচক।

বউদের উপর অন্যায় অত্যাচার ঃ ভারতীয় পরিবার ব্যবস্থায় বউ পেটানোর ঘটনা কম ঘটে না। ...বারের অন্দরমহলে মহিলাদের মারধর এবং তাদের উপর হিংসাত্মক ঘটনা প্রায়শই ঘটে। নিম্নবর্গের ...গোষ্ঠীর পরিবারসমূহে নিয়মিতভাবেই বউ পেটানোর ঘটনা ঘটে। এবং পাড়া-প্রতিবেশী তা অবাধে দেখতে ...তে পায়। উচ্চবর্গের জাতিগোষ্ঠীর পরিবারসমূহে এ ধরনের বধূ নির্যাতন একেবারে হয় না, এমন নয়। তবে ...জাতির পরিবারের অন্দরমহলের ঝগড়া-বিবাদ সর্বদাই সর্বসমক্ষে এসে পড়ে। কোনো কিছুই গোপন থাকে ... উঁচুজাতির পরিবারসমূহের অন্দরমহলের ঝগড়া-বিবাদ সাধারণত গোপন থাকে; সহজে প্রকাশ্যে এসে পড়ে ...ত না হলে, পণের জন্য বউ পেটানো ও বউ পোড়ানোর ঘটনা এখনও ঘটে? বউয়ের উপর অমানুষিক ...জের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। বউয়ের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্য-পরিধেয় দেওয়া হয় না। বউয়ের উপর ...সিক অত্যাচার চালানো হয় বিভিন্নভাবে। বউয়ের পিতার পরিবার-পরিজনদের বিরুদ্ধে অপমানসূচক ...বার্তা বলা হয়। বউকে প্রতিনিয়ত গঞ্জনা দেওয়া হয়। উঁচুজাতি ও সম্পন্ন পরিবারসমূহে বউয়ের উপর ...সিক নির্যাতন চালানো হয় বিভিন্নভাবে। উচ্চ শিক্ষিতা এবং নিজের কাজের জায়গায় সম্মানিত অবস্থানের ...কারী মহিলারাও বউ হিসাবে এ রকম অত্যাচারের হাত থেকে অব্যাহতি পান না। শ্যামাচরণ দুবে তাঁর *In-* ...*Society* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেছেন : "Even after four decades of Independence one ...quently reads of bride-burning and dowry deaths. Other forms of lesser violence are : ...ping indignities on the wife and her relations on the paternal side, making the wife do too ...ch work with little rest, failing to provide her adequate nutrition, and mentally torturing ... on several scores."

নারীর সম্পদের উপর পরিবারের নিয়ন্ত্রণ ঃ মহিলাদের ধন-সম্পদের উপরও পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ

কায়েম হতে দেখা যায়। সমাজের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলাদের "স্ত্রীধন' আইনানুসারে নারীর নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে স্ত্রীধনের ব্যবহারের ব্যাপারে স্ত্রীর স্বাধিকার স্বাধীনতা বিরোধ-বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। কারণ পারিবারিক প্রয়োজনের তাগিদে অথবা পরিবারের আর্থিক সংকট সামাল দেওয়ার জন্য স্ত্রীধন ব্যবহারের ঘটনা প্রায়শই ঘটে। এবং এই কারণে নারীর উপর চাপ সৃষ্টি, এমন কি নির্যাতনের ঘটনাও ঘটে। আবার নিম্নবিত্ত বা দরিদ্র পরিবারগুলিতে পরিস্থিতি অন্য রকম। এই সমস্ত পরিবারে মহিলাদের সম্পদ বলতে মূলত ব্যক্তিগত কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতাকে বোঝায়। এ রকম পরিবারের মহিলারা স্বোপার্জিত আয় খুশিমতো খরচ করতে পারে না। পরিবারের সদস্যদের অন্নসংস্থানের জন্যই মহিলাদের উপার্জন খরচ হয়ে যায়, অবশিষ্ট থাকে না বললেই চলে। সুতরাং আয়ের কিছুমাত্র জমা করার সুযোগ থাকে না। অর্থাৎ ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের আয় ও সম্পদের উপর পরিবারের নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়।

বস্তুত সাবেকি সমাজব্যবস্থার রীতিনীতি ও মূল্যবোধ থেকে মহিলারা এখনও মুক্তি পাননি। প্রচলিত প্রথা-প্রকরণের সঙ্গে মহিলাদের সংযোগ-সম্পর্ক অনতিক্রম্য প্রতিপন্ন হচ্ছে। রাম আহুজা (Ram Ahuja) তাঁর *Indian Social System* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : "Women are least liberated from the traditional values and age strongly oriented to the existing norms." বিবাহ সম্পর্কিত বর্তমান আইনের বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে মহিলাদের ধারণা অত্যন্ত কম। আহুজার সমীক্ষানুযায়ী মাত্র এক-দশমাংশ মহিলার বিবাহ-আইন সম্পর্কে অল্প কিছু ধারণা আছে। বিবাহের আইনানুমোদিত বয়স; বিবাহে নিজের জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিণী নির্বাচনের অধিকার; পণপ্রথা বিরোধী আইন; বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার; বিবাহ-বিচ্ছেদের পর আইনানুমোদিত খরপোষের অধিকার; বিধবা বিবাহের অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে বিদ্যমান আইন-সমূহের বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে মহিলাদের অধিকাংশেরই অজ্ঞতা অনস্বীকার্য। এবং এই অজ্ঞতার কারণেই প্রণীত আইনগুলির সুফল পাওয়া যায়নি।

পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলাদের ভূমিকা নিতান্তই অবহেলিত; কার্যত অনুপস্থিত। শুধুমাত্র ঘর-গৃহস্থালীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে পতিকে পত্নীর সঙ্গে পরামর্শ করতে দেখা যায়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কের বিষয়টি তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য তাৎপর্য অর্জন করতে পারেনি। পরিবার ব্যবস্থায় মহিলাদের অবদমিত অবস্থান সত্ত্বেও অধিকাংশ মহিলার জীবনের অভিজ্ঞতায় সন্তুষ্টির আধিক্য পরিলক্ষিত হয়; হতাশা বা বঞ্চনার ভাব বড়ো একটা দেখা যায় না। আহুজার সমীক্ষা অনুযায়ী মোটামুটি দুই-তৃতীয়াংশ মহিলাই নিজেদের বিবাহ ও পরিবার নিয়ে সন্তুষ্ট। আবার নিরক্ষর, অল্পশিক্ষিত ও দরিদ্র মহিলারা এবং মধ্য বয়স্কা মহিলারা পরিবার ও গার্হস্থ্য কাজকর্ম নিয়ে অধিকতর সন্তুষ্ট। বিপরীতক্রমে বিত্তবান, শিক্ষিতা ও অপেক্ষাকৃত কম বয়েসী গৃহবধূদের মধ্যে এই সন্তুষ্টির হার ও মাত্রা কম। অর্থাৎ শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা ও বয়সের সঙ্গে গৃহবধূদের সন্তুষ্টির মাত্রা ও হার বিপরীত মুখী সম্পর্কে সম্পর্কিত। রাম আহুজা মন্তব্য করেছেন : "Level of satisfaction with housework varies inversely with age, education and income."

জনবিন্যাস ও ভারতীয় নারী : ভারতে জনবিন্যাস বিচার-বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে নারী অবদমনের বিষয়টি স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয়। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় ভোগবাদী পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার প্রাধান্য এখনও অনস্বীকার্য। এ ধরনের সমাজব্যবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই কন্যাসন্তান অবাঞ্ছিত বিবেচিত হয়। প্রাসঙ্গিক সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে এ বিষয়ে অবহিত হওয়া যায়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization) এবং ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (Indian Medical Association) ভারতে জনবিন্যাস সম্পর্কিত সামাজিক সমীক্ষা সম্পাদন করেছে। এই সমীক্ষার প্রতিবেদন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদি তাৎপর্যপূর্ণ।

ভারতে কন্যাভ্রূণ ও শিশুকন্যা হত্যার ঘটনা ব্যাপকভাবে ঘটে। এবং নির্দয় ও নির্বিচারে এই হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়ে থাকে। সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি বছর কন্যাভ্রূণ হত্যার সংখ্যা গড়ে কুড়ি লক্ষ। স্বভাবতই বর্তমান ভারতে নারী-পুরুষের অনুপাত অতিমাত্রায় আশঙ্কাজনক। ব্রিটিশ আমলে এই অনুপাত যা ছিল, স্বাধীন ভারতে তা আরও নিম্নমুখী। Indian Medical Association-এর সমীক্ষা অনুযায়ী ব্রিটিশ আমলে ১৯০১ সালে ভারতবর্ষে প্রতি হাজার পুরুষ পিছু মহিলার সংখ্যা ছিল যেখানে ৯৭২, স্বাধীন ভারতে ১৯৯১ সালে, নব্বই বছরের ব্যবধানে, তা হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৯২৭; ২০০১ সালে এই সংখ্যা ছিল ৯৩৩ এবং ২০১১ সালের জনগণনায় যদিও এই অনুপাত সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৯৪০ হয়েছে।

আবার ভারতের সকল প্রদেশে এই অনুপাত এক রকম নয়। যে সমস্ত অঙ্গরাজ্যে নারী অবদমনের হার ও মাত্রা অধিক বা যে সমস্ত রাজ্যে নারী হীনতর অবস্থায় অবস্থিত, সেই সমস্ত অঙ্গরাজ্যেই আনুপাতিক বিচারে পুরুষের থেকে নারীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কম। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে একমাত্র কেরলের জনবিন্যাসগত পরিসংখ্যান ক্ষেত্রে সন্তোষজনক এবং উন্নত দেশসমূহের পরিসংখ্যানের সঙ্গে তুলনাযোগ্য। ভারতের যে সমস্ত অঙ্গরাজ্য অনেকাংশে সামন্ততান্ত্রিক প্রকৃতির এবং অনগ্রসর, সেই সমস্ত অঙ্গরাজ্যের জনবিন্যাসগত পরিস্থিতি হতাশাজনক। এই সমস্ত রাজ্যের আনুপাতিক বিচারে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় বেশ কম।

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় কন্যাসন্তানকে এখনও বোঝা হিসাবে অবজ্ঞা করা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি অত্যাধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যবস্থা (amnicentesis)-এর কল্যাণে মাতৃগর্ভে ভ্রূণাবস্থায় লিঙ্গ নির্ধারণ করা যায়। স্বভাবতই কন্যা-ভ্রূণ নষ্ট করা হচ্ছে ব্যাপক হারে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী একমাত্র মুম্বাই শহরেই ১৯৮৪ সালে চল্লিশ হাজার কন্যা ভ্রূণ নষ্ট করা হয়েছে। শিশু কন্যা হত্যার বিষয়টিও অবাহেলাযোগ্য নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত অবহেলার কারণে কন্যাসন্তানের অপমৃত্যু ঘটে। প্রাপ্ত এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে বছরে পুত্রসন্তানের থেকে তিন লক্ষ অধিক কন্যাসন্তানের মৃত্যু ঘটে শিশু অবস্থায়। বর্তমানে অবশ্য সরকার আইন করে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ বেআইনি বলে ঘোষণা করেছে।

কর্মক্ষেত্র, শ্রম ও ভারতীয় নারী : কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য : ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারী-অবদমন ও নারীর হীনতর অবস্থানের একটি বড়ো কারণ হল আর্থনীতিক ক্ষেত্রে নারীর স্বনির্ভরতার অভাব। ভারতে বিভিন্ন কাজকর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার পিতৃতান্ত্রিক প্রকৃতিই হল কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গগত বৈষম্যের মূল কারণ। আধুনিককালের কর্মক্ষেত্র উৎপাদনমুখী। এ রকম উৎপাদনশীল কাজকর্মে পুরুষদের নিয়োগের ব্যাপারে এক ধরনের স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব পরিলক্ষিত হয়। ভারতের বর্তমান সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দেশমূলক নীতি সম্পর্কিত চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৯ ধারায় একই কাজের জন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমমজুরির কথা বলা হয়েছে। সমমজুরি সম্পর্কিত আইনও প্রণীত হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও পরিস্থিতির মৌলিক কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। কর্মক্ষেত্রে পুরুষ শ্রমিকদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তুলনামূলক বিচারে নারী শ্রমিক কম পারিশ্রমিক পায়। অবশ্য আনুষ্ঠানিক ও বিধিবদ্ধ ক্ষেত্রগুলির কথা আলাদা। সাধারণভাবে বলা যায় যে, নারী শ্রমিক অধিক মাত্রায় শোষিত হয়। পিতৃতান্ত্রিক ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের জায়া ও জননীর ভূমিকায় এবং গার্হস্থ্য কর্ম, সন্তান প্রতিপালন ও আনুষঙ্গিক কাজকর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারীর এই সমস্ত কাজকর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। কারণ মহিলাদের গৃহকর্মের সঙ্গে আর্থনীতিক উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কহীন। ভারতে আদমশুমারির বিধি-ব্যবস্থা অনুযায়ী কেবলমাত্র তাঁরাই শ্রমিক হিসাবে পরিগণিত হন যাঁরা আর্থনীতিক উৎপাদন কর্মের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত। এই উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে নারী যোগসূত্রহীন। এই কারণে সাধারণভাবে ঘরকন্যার কাজকর্মে নিযুক্ত মহিলাদের গৃহবধূ হিসাবে গণ্য করা হয়, শ্রমিক হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। এই মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতে নারী শ্রমিকের হিসাব হল শতকরা ২৮.৫৭। কিন্তু এই হিসাব বাস্তব চিত্রকে প্রতিফলিত করে না। কারণ এই বিচার-বিবেচনার বাইরে বহু নারী শ্রমিক বর্তমান। এই কারণে এ বিষয়ে ভারতের জনগণনা সূত্রে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানের সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানের বিস্তর গরমিল পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বব্যাংক কর্তৃক সাম্প্রতিককালে সম্পাদিত একটি সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতের নারী শ্রমিক হল মোট শ্রমিকের এক-তৃতীয়াংশ।

নারীশ্রমিকের হিসাব ও অবস্থা সন্তোষজনক নয় : সাম্প্রতিককালে গ্রাম-শহর নির্বিশেষে মহিলারা পরিবারের পরিধির বাইরে এসে বিভিন্ন কাজকর্মে নিযুক্ত হচ্ছে। ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমশক্তির মাত্র শতকরা তেরো ভাগ (১৩.০) ছিল নারীশ্রমিক। ১৯৯১ সালের জনগণনায় নারীশ্রমিকের সংখ্যা

শতকরা হিসাবে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৮.৫৭। তবে নারীশ্রমিকের সিংহভাগ, অর্থাৎ প্রায় আশি শতাংশ কৃষিমূলক কাজকর্মে নিযুক্ত। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রশাসনিক কৃত্যকসমূহে এবং সরকারি উদ্যোগসমূহের মোট শ্রমশক্তির মাত্র বারো শতাংশ হল মহিলা। তাছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও ক্ষমতার পরিকাঠামো থেকে মহিলাদের কার্যত বাইরে রাখা হয়েছে। ভারতে শ্রমশক্তির ক্ষেত্রে মহিলাদের এই পশ্চাদ্‌পদ অবস্থানের জন্য কতকগুলি কারণ দায়ী বলে মনে করা হয়। এই কারণগুলি হল নিরক্ষরতা, সমাজব্যবস্থায় অবদমিত অবস্থান, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার অভাব প্রভৃতি। প্রাপ্ত একটি পরিসংখ্যান অনুসারে ভারতে মোট নারীশ্রমিকের শতকরা ৫২.৫৯ জন নিরক্ষর; শতকরা ২৮.৫৬ জনের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের স্কুল শিক্ষা আছে; উচ্চমাধ্যমিক স্তরে স্কুল শিক্ষা আছে ১৩.৭৮ শতাংশের এবং স্নাতক ও উচ্চতর শিক্ষা আছে মাত্র ৫.০৭ শতাংশের। আবার শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে পার্থক্যের নিরিখে গ্রামাঞ্চলের নারীশ্রমিকের শিক্ষার হার ও মান হতাশাজনক। ভারতে মহিলারা শ্রমশক্তির বাজারে হাজির হয় নানা কারণে। তবে অর্থের অভাবই হল মূল কারণ। অন্যান্য কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : পতির কম পারিশ্রমিক, স্বামীর শারীরিক অসামর্থ্য, পতি-পরিত্যক্তা বা পতির কাছ থেকে অন্ন-বস্ত্র না পাওয়া, অসহায় বিধবা অবস্থা প্রভৃতি। তবে প্রায় নব্বই শতাংশ মহিলাই আর্থনীতিক প্রয়োজনের তাগিদে নারীশ্রমিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৮১ সালের সামাজিক কল্যাণ পরিসংখ্যান (Social Welfare Statistics, 1981) সূত্রে এই পরিসংখ্যান প্রাপ্ত।

কাজকর্মে লিঙ্গগত বৈষম্য : ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় কাজকর্ম সম্পাদনের দায়-দায়িত্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে লিঙ্গাগত অসাম্য-বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। যাবতীয় গার্হস্থ্যের কাজকর্মের দায়িত্ব অবধারিতভাবে মহিলাদের উপর বর্তায়। ঘরের কাজকর্মে গৃহভৃত্য নিয়োগ করার মতো আর্থিক সামর্থ্য অধিকাংশ পরিবারেরই থাকে না। স্বভাবতই রান্নাবান্না, সন্তান প্রতিপালন, ঘরদোর সাফাই, পোশাক-আশাক পরিষ্কার করা প্রভৃতি পরিবারের অভ্যন্তরের সর্ববিধ কাজকর্ম মহিলাদেরই সম্পাদন করতে হয়। এই সমস্ত কাজকর্মে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া যায় না। কারণ ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত ধারণা অনুসারে গৃহকর্মে নারীর সঙ্গে পুরুষ হাত লাগালে তা উপহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অনেক মহিলাকে বৃত্তিগত কাজকর্মে বা চাকরি-বাকরির প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে দিনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করতে হয়। তারপর বাড়ি ফিরে তারা ঘরের কাজকর্মে হাত লাগাবে পরিবারের মানুষজন তাই আশা করেন। চাকরিরতা অনেক মহিলার পক্ষে তা শারীরিকভাবে সম্ভব হয় না। তাঁদের গঞ্জনা শুনতে হয়। বাড়িতে এ নিয়ে অশান্তি হয়। সংশ্লিষ্ট মহিলারাও অনেক ক্ষেত্রে অশান্তি ও অপরাধবোধে ভোগেন। নিম্নবর্গের বা শ্রেণির মহিলাদের উপর কাজকর্মের চাপ আরও বেশি। এ রকম পরিবারের মহিলাদের সংসারের আর্থনীতিক দায়-দায়িত্ব বহুলাংশে বহন করতে হয়। চাষ-আবাদের কাজে তারা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। আবার কামার-কুমোর-তাঁতি প্রভৃতি কারিগর পরিবারের মহিলারাও পারিবারিক পেশাগত কাজকর্মে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকে। হিন্দু সমাজব্যবস্থায় সাবেকি ধারা অনুসারে জাতিগত পেশায় মহিলাদের ভূমিকা বা দায়-দায়িত্ব নির্ধারিত থাকে। সুতরাং পরিবারের মোট আয়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ পরিবারের মহিলা সদস্যদের অবদানের ফল।

পুরুষশাসিত সমাজে আঘাত : এ প্রসঙ্গে আর একটা বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। বিষয়টি উচ্চ বর্গের বা শ্রেণির পরিবারসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত। সমাজের উঁচুতলায় পুরুষ-কর্তৃত্বের বিষয়টি বিশেষভাবে বর্তমান। পরিবারের আর্থিক দায়-দায়িত্ব পুরুষ বহন করে। এই কারণে এ রকম পরিবারে পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্প্রতিককালে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের পরিবর্তন ঘটেছে। উঁচুতলার অনেক পরিবারের মহিলারা এখন অর্থকরী চাকরি-বাকরি করছেন। মহিলাদের এই উপার্জনের সুবাদে সংসারের আর্থিক সংগতি ও সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিককালে সভ্য জীবন-যাপনের খরচ বেড়েছে বহুগুণ। এই খরচ সামাল দেওয়া শুধুমাত্র পুরুষের উপার্জনে আর সম্ভব হয় না। স্বাভাবিক কারণে পুরুষশাসিত ভারতীয় সমাজে বহির্জগতের বিভিন্ন পেশায় মহিলাদের নিয়মিত এই উপার্জনকে স্বীকার ও সমর্থন করতে হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে অন্যত্র। পত্নীর উপার্জন পতির উপার্জনের থেকে বেশি হলে পুরুষের পৌরুষ বিপন্নবোধ

করে; অহংবোধ আহত হয়। স্ত্রীর উপার্জনে সংসার চালাতে পুরুষের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষ-শাসিত সমাজব্যবস্থার ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিবর্তিত এই পরিস্থিতির বিরোধ বাধে। আর্থনীতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের স্বনির্ভরতা পুরুষশাসিত সমাজ স্বচ্ছন্দে মেনে নিতে পারে না। অথচ পরিবর্তিত পরিস্থিতির চাপে করারও কিছু থাকে না। বস্তুত বর্তমানের বিকাশমান সামাজিক রূপচিত্র পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সাবেককালের পুরুষ-কর্তৃত্বমূলক সামাজিক জীবনধারার জের বর্তমানেও পর্যাপ্ত চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। এ রকম এক টানাপোড়েনের মধ্যে সমাজ বদলাচ্ছে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করছে। কিন্তু এই সামঞ্জস্য সাধনের প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীর গতির। এই কারণে এ নিয়ে মাঝে মাঝে অস্থিরতার উত্তেজনারও সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে শ্যামাচরণ দুবের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। *Indian Society* শীর্ষক গ্রন্থে দুবে বলেছেন : "Men dominate, but women also have ways of getting things done according to their desires and wishes....The emerging ethos does not favour patriarchy, but the hangover of the past is offen unrelenting. Society is adapting itself to the altered scenario, even if the pace of adaptation is very slow."

আর্থনীতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার হার ও মান মোটেই সন্তোষজনক নয়। পিতার ও পতির সম্পত্তিতে মহিলাদের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে অধিকাংশ মহিলাই অবহিত নয়। মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ মহিলা স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার ভোগ করে। এই সংখ্যা মোটেই সন্তোষজনক নয়। আবার পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার ভোগ করে এমন মহিলার সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। এ রকম মহিলার সংখ্যা অর্ধ শতাংশের অধিক হবে না। কারণ পৈত্রিক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সম্পর্কে অবহিত মহিলার সংখ্যা নিতান্তই কম। বিপরীতক্রমে স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সম্পর্কে অবহিত মহিলার সংখ্যা বেশ ভালোই।

গ্রামাঞ্চলে কর্মরত ও রোজগার করা এবং আর্থিক ক্ষেত্রে স্বনির্ভর মহিলার সংখ্যা বেশ কম, এক- দশমাংশের মতো। আবার সামগ্রিক বিচারে নিজেদের কাজের মজুরির ব্যাপারে অধিকাংশ মহিলাই অসন্তুষ্ট। কাজের প্রকৃতি ও পারিশ্রমিকের পরিমাণ নিয়েই অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। মহিলাদের অনেকেরই আয় পারিবারিক আয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়। অধিকাংশ মহিলাই নিজেদের রোজগারের অর্থকে খুশিমতো খরচ করতে পারেন না। কর্মরত মহিলাদের ঘরের বাইরেও কাজের বোঝা বহন করতে হয়। কিন্তু ঘর-গৃহস্থালীর কাজকর্মের ব্যাপারে অন্যান্য মহিলাদের মতোই সমান সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। নিজেদের অধিকার সম্পর্কে মহিলাদের সচেতনতা ও অবগতির অভাব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে রাম আহুজা তাঁর *Indian Social System* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন : "The main barriers in the awareness of rights are : illiteracy, excessive involvement in domestic chores, household constraints (that is, attitudes of husband and in-laws), an economic dependence on males."

১৩.১০ সাংবিধানিক অধিকার ও অন্যান্য আইনানুমোদিত অধিকার এবং ভারতীয় নারী (Constitutional Rights and other Legal Rights & Indian Women))

সনাতন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তন অনেকাংশে সদর্থক ও প্রগতিমূলক। এতদ্‌সত্ত্বেও সমাজব্যবস্থায় নারীর মর্যাদাগত অবস্থানের উন্নতি ঘটেছে বা নারী অবদমনের অবসান ঘটেছে, এমন কথা বলা যাবে না। মহিলাদের নিরক্ষরতা এক্ষেত্রে একটি বড়ো বাধা। বস্তুত নিরক্ষরতা ভারতীয় সমাজব্যবস্থার একটি বড়ো ব্যাধি। এই ব্যাধিটি সমাজজীবনের অল্পবিস্তর সকল বিষয়কেই কম-বেশি প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করে। ১৯৯১ সালের জনগণনার পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই হল নিরক্ষর। মহিলাদের ক্ষেত্রে অবস্থা অধিকতর হতাশাব্যঞ্জক। মোটামুটি মহিলাদের মধ্যে

তিন-পঞ্চমাংশই হল নিরক্ষর। নিরক্ষরতার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষণশীলতা, কুসংস্কার, গোঁড়ামি প্রভৃতিও নারী অবদমন ও নারীজাতির মর্যাদাগত হীনতার জন্য বহুলাংশে দায়ী। তবে এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতার অপসারণ রাতারাতি সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে সদর্থক এবং প্রগতিশীল প্রবল জনমত গড়ে তোলা দরকার। কিন্তু এটাও খুব একটা সহজ কাজ নয়। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের স্বার্থবিরোধী বিভিন্ন ব্যবস্থা বা অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য প্রগতিমূলক নানা আইন প্রণয়ন করা যায় এবং করা হয়েছে। এই সমস্ত আইনের মাধ্যমে ভারতের মহিলাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে পুরুষের মতো মহিলাদেরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে এই অধিকারগুলিকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত তৃতীয় অধ্যায় ছাড়াও ভারতীয় সংবিধানের অন্যান্য অংশে অধিকার সম্পর্কে উল্লেখ ও আলোচনা আছে। সংশ্লিষ্ট অধিকারগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে ১২ থেকে ৩৫ ধারার মধ্যে মৌলিক অধিকারসমূহের আলোচনা আছে। মূল সংবিধানে সাত শ্রেণির মৌলিক অধিকারের উল্লেখ ছিল। ৪৪তম সংবিধান সংশোধন (১৯৭৮)-এর মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকারের অধ্যায় থেকে বাদ পড়েছে। সম্পত্তির অধিকার বর্তমানে সাধারণ আইনগত অধিকারে পরিণত হয়েছে এবং ৩০০ (ক) ধারায় সংরক্ষিত আছে। বর্তমানে সংবিধানে নিম্নলিখিত ছয় প্রকার মৌলিক অধিকার সন্নিবিষ্ট আছে।

(১) সাম্যের অধিকার ঃ সাম্যের অধিকারের মাধ্যমে সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে সমতা, আইনের দৃষ্টিতে সাম্য, আইনের সমান সংরক্ষণ, নারী-পুরুষ বিচারে বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধকরণ, সরকারি চাকরি বা পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বিচারে বৈষম্য নিষিদ্ধকরণ প্রভৃতি উল্লখযোগ্য। সংবিধানের প্রস্তাবনায় সকলের জন্য মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠার সাধু সঙ্কল্প ঘোষণা করা হয়েছে। প্রস্তাবনার এই ঘোষণাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সংবিধানের ১৪ থেকে ১৮ এই পাঁচটি ধারায় সাম্যের অধিকার সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি লিপিবদ্ধ আছে। চতুর্থ অধ্যায়ের নির্দেশমূলক নীতির মাধ্যমেও আর্থনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য ও ন্যায়-নীতির কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া সংবিধানের ৩২৬ ধারায় রাজনীতিক সাম্যের উল্লেখ আছে। আবার প্রচলিত দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনের মাধ্যমেও সাম্যের নীতিকে কার্যকর করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(২) স্বাধীনতার অধিকার ঃ সংবিধানের ১৯ থেকে ২২ ধারার মধ্যে ব্যক্তির স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাক্য ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার ও ভারতের যে-কোনো জায়গায় বসবাস করার, বৃত্তিগত স্বাধীনতা প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ২১ ধারায় জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

(৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার ঃ সংবিধানের ২৩ ও ২৪ ধারায় শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারের কথা বলা হয়েছে। মানুষকে নিয়ে ব্যাবসা বা বেগার খাটানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দাসপ্রথা, স্ত্রীলোককে দিয়ে অনৈতিক কাজ করানো ও বিনা বেতনে কাজ করানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

(৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ঃ সংবিধানের ২৫ থেকে ২৮ ধারার মধ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে আলোচনা আছে। বিবেকের স্বাধীনতা অনুসারে ধর্ম স্বীকার, ধর্ম আচরণ ও ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তির ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের উল্লেখ আছে সংবিধানের ২৫ ধারায়।

(৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষাগত অধিকার ঃ সংস্কৃতি বা জীবনধারাগত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারে অধিকারের কথা বলা হয়েছে সংবিধানের ২৯ ও ৩০ ধারায়।

(৬) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার ঃ সংবিধানের ৩২ থেকে ৩৫ ধারার মাধ্যমে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে অধিকার দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ ব্যবস্থা ঃ সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলিই সব নয়। মহিলাদের বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এবং নারীজাতির জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া

হয়েছে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রকে বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য রাষ্ট্র বিভিন্ন সময়ে বিশেষাধিকারমূলক বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে। সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব সম্পাদনের ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে একটি সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা। সামাজিক, আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এ বিষয়ে একাধিক আইন প্রণয়ন করেছে।

সামাজিক আইনসমূহ ও নারীজাতির স্বার্থ ঃ বিবাহ ব্যবস্থা ঃ সামাজিক আইনসমূহের সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের স্বার্থ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : বিবাহ, দত্তকগ্রহণ এবং গর্ভপাত। বিবাহ সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ আইনগুলি হল : '১৮৫৬ সালের বিধবা বিবাহ আইন' (Widow Remarriage Act, 1856), '১৯৫৪ সালের বিশেষ-বিবাহ আইন' (Special Marriage Act, 1954) এবং '১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইন' (Hindu Marriage Act, 1955)। বিবাহ সম্পর্কিত উল্লিখিত আইনগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি হল : বিবাহের বয়স, বহু বিবাহ, জীবনসঙ্গী বা জীবনসঙ্গিনী নির্বাচন, বৈধ-অবৈধ বা সিদ্ধ-অসিদ্ধ বিবাহ, দাম্পত্য জীবনের অধিকারসমূহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ব, খরপোষ, পণপ্রথা, বালবিবাহ প্রভৃতি।

দত্তক গ্রহণ ঃ দত্তক গ্রহণের বিষয়টিও সামাজিক আইনের অন্তর্ভুক্ত। শিশুদের দত্তক হিসাবে গ্রহণ করা সম্পর্কিত আইন প্রণীত হয় ১৯৫৬ সালে। এই আইনটির নাম হল ১৯৫৬ সালের হিন্দু দত্তক ও ভরণপোষণ আইন (Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956)। বিবাহিত মহিলা, অবিবাহিত মহিলা, বিধবা মহিলা এবং বিবাহ-বিচ্ছিন্ন মহিলারা শিশুকে দত্তক হিসাবে গ্রহণ করার অধিকার ভোগ করেন। তবে দত্তক হিসাবে যাকে গ্রহণ করা হবে তার বয়স হতে হবে পনেরো বছরের নীচে এবং তাকে অবিবাহিত হতে হবে।

গর্ভপাতের অধিকার ঃ গর্ভপাতের বিষয়টিও মহিলাদের স্বার্থ সম্পর্কিত। এবং এই বিষয়টি সামাজিক আইনের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৭০ সাল অবধি গর্ভপাত ফৌজদারি এবং দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে পরিগণিত হত। ১৯৭১ সালে গর্ভপাতের অধিকার স্বীকার করে একটি আইন প্রণীত হয়। সংশ্লিষ্ট আইনটির নাম হল 'Medical Termination of Pregnancy Act'। এই আইনটি ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে কার্যকর হয়। এই আইনে সন্তানসম্ভবা মহিলাকে এবং গর্ভপাতকারীকে গর্ভপাতের ব্যবস্থা করার অধিকার দেওয়া হয়। গর্ভপাতকারী চিকিৎসক হবেন একজন নিবন্ধীকৃত ডাক্তার। গর্ভাবস্থা ১২ সপ্তাহের অধিক হওয়া চলবে না। গর্ভপাতের অধিকার ভোগের জন্য কতকগুলি অনুমোদিত কারণের কথা আইনে বলা হয়েছে। ধর্ষণের কারণে সৃষ্ট গর্ভাবস্থা এবং গর্ভনিরোধক ব্যবস্থার ব্যর্থতার কারণে সৃষ্ট গর্ভাবস্থা নষ্ট করা যাবে। গর্ভবতী মহিলার শরীর-স্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্য গর্ভপাত করা যাবে। সন্তান জন্মালে মায়ের শরীর ও মন ভীষণভাবে ভেঙে পড়ার আশঙ্কা থাকলে গর্ভপাত করা যাবে। সন্তান জন্মালে সেই সন্তান শারীরিক বা মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকলে গর্ভপাত করা যাবে। বর্তমানে বিশেষ পরিস্থিতিতে গর্ভাবস্থার ২০ সপ্তাহ পর্যন্ত গর্ভপাত আইনসিদ্ধ হয়েছে।

আর্থনীতিক আইনসমূহ ও নারীজাতির স্বার্থ ঃ মহিলাদের আর্থনীতিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সহায়ক আর্থনীতিক আইনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আর্থনীতিক স্বার্থ ও আর্থনীতিক আইনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়াদি হল : সম্পত্তির অধিকার, উত্তরাধিকার, সমান মজুরি, চাকরির নিরাপত্তা, মাতৃ কল্যাণমূলক সুযোগ-সুবিধা, কাজের পরিবেশ প্রভৃতি। ১৯৫৬ সালে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (Hindu Succession Act, 1956) প্রণীত হয়। এই আইনে মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে সহায়ক বিধি-ব্যবস্থার কথা আছে। ১৯৪৮ সালে প্রণীত হয় কারখানা আইন (Factory Act, 1948)। এই আইনে কাজের পরিস্থিতি-পরিমণ্ডল, মাতৃকল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি এবং চাকরির নিরাপত্তা সম্পর্কে আলোচনা আছে। সমমজুরি সম্পর্কিত আইন প্রণীত হয় ১৯৭৬ সালে। এই আইনটির নাম হল : ১৯৭৬ সালের সমমজুরি আইন (Equal Remuneration Act, 1976)।

সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার : ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে 'স্ত্রীধন' ও 'অ-স্ত্রীধনে'র মধ্যে পার্থক্যকে দূর করেছে। সম্পত্তিতে মহিলাদের অধিকার বলতে জায়া-জননী এবং অবিবাহিতা কন্যা ও বিধবা নারী হিসাবে মহিলার অধিকারকে বোঝায়। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে পিতার সম্পত্তিতে ভ্রাতাদের সঙ্গে কন্যাদেরও সমানাধিকার দেওয়া হয়েছে। আবার প্রয়াত পতির সম্পত্তিতে পুত্রকন্যাদের সঙ্গে বিধবা পত্নীও সমানাধিকার ভোগ করে।

কারখানায় নারী শ্রমিকের সুযোগ-সুবিধা : ১৯৪৮ সালের কারখানা আইনে মহিলা শ্রমিক- কর্মচারীদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা আছে। কোনো কারখানায় মহিলা শ্রমিক-কর্মচারীদের সংখ্যা যদি তিরিশ বা তার বেশি হয়, তাহলে কারখানার কর্তৃপক্ষকে মহিলা-শ্রমিক কর্মচারীর শিশু সন্তানদের তত্ত্বাবধানের জন্য ক্রেইশ (Creche)-এর মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হয়। তাছাড়া সকল কারখানাতেই মহিলা শ্রমিক-কর্মচারীদের কিছু বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহিলাদের জন্য পৃথক শৌচাগারের ব্যবস্থা করতে হয়। মহিলাদের কাজের সময় দিনের বেলা দশটা-পাঁচটার মধ্যে হতে হবে। এবং এক দিনে ন'ঘণ্টার অধিক মহিলাদের কাজ করানো যাবে না। আবার পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সকল শ্রমিকের জন্য কারখানায় কিছু সুযোগ-সুবিধা বা ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এই সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য। প্রাত্যহিক কাজের সময়সীমা, সাপ্তাহিক বিশ্রাম, কারখানায় বিশ্রামকক্ষের ব্যবস্থা, প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, কর্মরত অবস্থায় মেশিন থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রভৃতি এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

সমমজুরি : ১৯৭৬ সালের সমমজুরি আইনে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অভিন্ন কাজের জন্য সমমজুরির কথা বলা হয়েছে। পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকের মধ্যে পারিশ্রমিকের ব্যাপারে পার্থক্যমূলক আচরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইন অমান্যের কারণে অমান্যকারী নিয়োগকর্তার শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

রাজনীতিক অধিকারসমূহ ও নারীজাতি : স্বাধীন ভারতের সংবিধানে নারীজাতির জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহিলাদের এই দুটি সাংবিধানিক রাজনীতিক অধিকার হল : নারী ভোটাধিকার এবং আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের অধিকার। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে (The Government of India Act, 1935) শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে মহিলাদের ভোটাধিকার ও প্রতিনিধিত্বের অধিকার স্বীকার করা হয়। অনতিবিলম্বে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ছাপান্ন জন মহিলা আইনসভায় আসন লাভ করেন। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী পর্যায়ে ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থায় মহিলাদের ভূমিকার পরিধি প্রসারিত হয়। এই সময় মহিলা ভোটদাতার সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য আইনসভাগুলিতে ও সংসদে মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।

১৯১৭ সালে মহিলাদের ভোটাধিকারের দাবি প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করা হয়। ১৯১৮ সালে এই দাবি ব্রিটিশ সরকার বাতিল করে দেয়। তবে পরের বছরই ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকার মহিলাদের ভোটাধিকার সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের ব্যাপার রাজ্যগুলিকে ক্ষমতা প্রদান করে। সমকালীন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মহিলাদের ভোটাধিকার প্রদান করে আইন প্রণীত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। ১৯২৩ সালে রাজকোটে; পরের বছর ১৯২৪ সালে ট্রাভানকোর ও কোচিনে; তারপরের বছর ১৯২৫ সালে মাদ্রাজ ও উত্তরপ্রদেশে; তারপরের বছর ১৯২৬ সালে অসম ও পাঞ্জাবে এবং ১৯২৯ সালে ওড়িশা ও বিহারে নারী-ভোটাধিকার সম্পর্কিত আইন প্রণীত হয়।

ভারতে সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে মহিলাদের বহু ও ব্যাপক অধিকার দেওয়া হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত অনুযায়ী অন্যান্য দেশের মহিলাদের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে মহিলাদের অধিকারের সংখ্যা ও পরিধি অধিকতর ব্যাপক। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। তবে নিজেদের আইনানুমোদিত অধিকারসমূহ সম্পর্কে ভারতের মহিলাদের সচেতনতার মান ও পরিধি প্রসঙ্গে বিতর্কের অবকাশ আছে।

সমাজবিজ্ঞানী রাম আহুজা (Ram Ahuja) রাজস্থানের কয়েকটি গ্রামের মহিলাদের নিয়ে এ বিষয়ে একটি গবেষণামূলক সমীক্ষা সম্পাদন করেন। সংশ্লিষ্ট সমীক্ষা সূত্রে আহুজা মহিলাদের অধিকার-সচেতনতা সম্পর্কে কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এ বিষয়ে আলোচনা করা আবশ্যক। আহুজার মতানুসারে সামাজিক, আর্থনীতিক, রাজনীতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্বীকৃত অধিকারসমূহের ব্যাপারে মহিলাদের সচেতনতার মান ও ব্যাপকতা চারটি মূল বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। এই চারটি বিষয় হল : সংশ্লিষ্ট মহিলার ব্যক্তিগত পটভূমি, সামাজিক পরিবেশ, আত্মবাদী উপলব্ধি এবং আর্থনীতিক ভিত্তি। শিক্ষাগত মান, ব্যক্তিগত বিভিন্ন চাহিদা, উচ্চাশার পর্যায় প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে মহিলার ব্যক্তিগত পটভূমি নির্ধারিত হয়। আত্মীয়-পরিজনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, পরিবারের সদস্যদের ধ্যান-ধারণা, স্বামীর মূল্যবোধসমূহ প্রভৃতি মহিলার সামাজিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। মহিলার মর্যাদা ও ভূমিকার দ্বারা আত্মবাদী উপলব্ধি (subjective perception) নির্ধারিত হয়। মহিলা কোন্ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত তার দ্বারা তাঁর আর্থনীতিক ভিত্তি স্থিরীকৃত হয়।

১৩.১১ নারী আন্দোলনের প্রকারভেদ (Types of Woman's Movements)

সমাজবিজ্ঞানী নীরা দেশাই (Neera Desai) বিভিন্ন গ্রন্থে ভারতে নারী-আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এই সমাজবিজ্ঞানীর অভিমত অনুযায়ী মহিলাদের স্বাধীনতা ও সাম্যের সাধারণ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে সংগঠিত উদ্যোগই হল নারী-আন্দোলন। নারী জাতির জীবনকে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করে এ রকম যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি নারী-আন্দোলন অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর। নির্ধারিত উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে অগ্রবর্তীমূলক উদ্যোগ-আয়োজন আবশ্যক। এবং এর জন্য দরকার হল মহিলাদের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করার সহায়ক মতাদর্শমূলক সংহতি সূত্র। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী নিজেদের তাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্নভাবে নারী-আন্দোলনের শ্রেণিবিভাজন করেছেন।

কল্পনা শা তাঁর *Women's Liberation and Voluntary Action* শীর্ষক গ্রন্থে নারী-আন্দোলনকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। নারী-আন্দোলনের এই তিনটি শ্রেণি হল : (এক) মধ্যপন্থী বা মহিলাদের অধিকারসমূহের অবস্থা (Moderate or Women's Rights Position); (দুই) প্রগতিবাদী নারীবাদ (Radical Feminism); (তিন) সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ (Socialist Feminism)। সাম্প্রতিককালের সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের বৈষম্যমূলক অবস্থান এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের অধীনতামূলক অবস্থান থেকে মুক্তির উপায় প্রভৃতি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে কল্পনা শাহ নারী-আন্দোলনের এই শ্রেণি বিভাজন করেছেন।

সমাজবিজ্ঞানী গেইল ওমভেদ (Gail Omvedt) তাঁর *Women and Rural Revolt in India* শীর্ষক গ্রন্থে আদর্শবাদমূলক মানদণ্ডে নারী-আন্দোলনকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। এই দুটি শ্রেণি হল: (১) মহিলাদের সাম্যের আন্দোলন এবং (২) নারী-আন্দোলন। মহিলাদের সাম্য-আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল বিদ্যমান রাজনীতিক, আর্থনীতিক ও পারিবারিক কাঠামোতে মহিলাদের জন্য অবস্থানগত সমমর্যাদা অর্জন এবং পিতৃতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক অবশিষ্টাংশসমূহের অবসান। এ ধরনের নারী-আন্দোলন সমসাময়িক আর্থনীতিক, রাজনীতিক ও পারিবারিক কাঠামোকে সরাসরি আঘাত নাও করতে পারে। কিন্তু নারী-স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রমের লিঙ্গগত বিভাজনকে সরাসরি আক্রমণ করা হয়েছে।

কুমকুম সংগারী ও সুদেশ ভইদ (Kukum Sangari and Sudesh Vaid) তাঁদের *Recasting Woman : Essay in Colonial History* শীর্ষক গ্রন্থে নারী-আন্দোলনকে তত্ত্বগত বিচারে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই দুটি ভাগ হল : (ক) মহিলাদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক উপায়-পদ্ধতির আধুনিকীকরণ এবং (খ) গৃহে এবং কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম্পর্কের গণতন্ত্রীকরণ। এই দুই সমাজবিজ্ঞানীর অভিমত অনুযায়ী শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণির মহিলাদের আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যমান সমাজব্যবস্থায় পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা-সম্পর্কের গণতন্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে এ রকম নারী-আন্দোলনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

জানা ম্যাটসন এভারেট (Jana Matson Everett) তাঁর *Women and Social Change in India* শীর্ষক গ্রন্থে দুটি পৃথক মতাদর্শগত নারীবাদের ভিত্তিতে নারী আন্দোলনকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। এই দুটি শ্রেণি হল : (এক) সমিতিবদ্ধ নারীবাদ (Corporate Feminism); এবং (দুই) উদারনীতিক নারীবাদ (Liberal Feminism)। প্রথম শ্রেণির নারী-আন্দোলনে রাজনীতিতে মহিলাদের জন্য বৃহত্তর ভূমিকা দাবি করা হয়। কারণ হিসাবে বলা হয় যে, মহিলা হিসাবে রাজনীতিতে তাদের অবদান রাখার বিশেষ অবকাশ আছে। উদারনীতিক নারীবাদ আন্দোলনে দাবি করা হয় যে, নারী পুরুষের সমান। সুতরাং পুরুষের মতো নারীরও সমানাধিকার থাকবে। পুরুষ জাতির অধিকারসমূহকে নারী জাতির ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করতে হবে।

আবার সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এবং পদ্ধতিগত বিচারে ভারতে নারী-আন্দোলনের প্রকারভেদ করা হয়েছে। তদনুসারে তিন ধরনের নারী-আন্দোলনের কথা বলা হয় : (১) স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাক্কালে সামাজিক সংস্কার আন্দোলনসমূহ; (২) ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত আন্দোলনসমূহ; এবং (৩) আন্তর্জাতিক নারী-দশকের সময় ও পরে উদ্ভূত আন্দোলনসমূহ।

১৩.১২ স্বাধীন ভারতে নারী-আন্দোলন (Women's Movements in Post Independence India)

রূপান্তরের সূত্রপাত : স্বাধীন ভারতে আইন, রাজনীতি, শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীজাতির অবস্থান ও মর্যাদাগত মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই ভারতে সামাজিক সংস্কার আন্দোলন সংগঠিত হয়। এই সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে নারীজাতির অবস্থার উন্নয়নের কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ প্রসঙ্গে গোঁড়ামির বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায়ের আপসহীন সংগ্রাম স্মরণীয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় মহিলাদের সদর্থক উদ্যোগ-আয়োজনের অবদান অনস্বীকার্য। তিরিশের দশকের মাঝামাঝি মহাত্মা গান্ধি নারী জাতির স্বার্থ ও স্বাধীনতার অতন্দ্র সংগ্রামী নেত্রী মৃদুলা সরাভাই-কে বলেছিলেন : "I have brought the Indian woman out of kitchen, it is upto you to see that they don't go back."

বিদেশী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মহিলাদের রাজনীতিক ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাক্কালে প্রমাণিত হয়েছে যে, পুরুষ সঙ্গ ছাড়াই মহিলারা মিছিলে যোগ দিতে পারে, আইন অমান্য আন্দোলনের শামিল হতে পারে, জেলে যেতে পারে প্রভৃতি। সুতরাং ভোটাধিকার, অর্থকরী চাকরি, পৈত্রিক সম্পত্তিতে অধিকার প্রভৃতি সঙ্গতভাবেই মহিলারা দাবি করতে পারে। গান্ধিবাদী, সমাজতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট, চরমপন্থী বৈপ্লবিক প্রভৃতি স্বাধীনতা সংগ্রামের সকল ধারায় সমকালীন ভারতের মহিলারা অংশগ্রহণ করেছে। তারা কৃষক-আন্দোলন ও শ্রমিক-আন্দোলনেরও শামিল হয়েছে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর মহিলাদের আইনগত ও সাংবিধানিক অধিকার, স্বাধীনতা ও সাম্যের স্বীকৃতির উপর জোর দেওয়া হয়। মহিলাদের ভোটাধিকার স্বীকার করা হয়। স্বাধীন ভারতের আইনমন্ত্রী আমবেদ্‌করের নেতৃত্বাধীন কমিটি একটি বিল পেশ করে। এই বিলে বিবাহের বয়স বৃদ্ধি, একগামিতা, মহিলাদের বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার, উত্তরাধিকার ও খরপোষের অধিকার, মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার, পণকে স্ত্রীধন হিসাবে স্বীকার প্রভৃতি প্রস্তাব করা হয়। সমকালীন সমাজের রক্ষণশীল অংশ এবং রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ কংগ্রেসের কিছু প্রবীণ নেতা বিলটির বিরোধিতা করেন। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, সমাজ সংস্কারকরা এবং নারী-আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা বিলটিকে দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করেন। কিন্তু বিলটি স্থগিত হয়ে যায়। তার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট বিলটির অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি বিষয়কে নিয়ে চারটি পৃথক আইন প্রণীত হয়। এই আইনগুলি হল : 'হিন্দু বিবাহ আইন' (The Hindu Marriage Act), 'হিন্দু উত্তরাধিকার আইন' (The Hindu Succession Act), 'হিন্দু নাবালক ও অভিভাবক আইন' (The Hindu Minority and Guardianship Act), 'হিন্দু দত্তক ও খরপোষ আইন' (The Hindu Adoption and Maintenance Act)।

হিন্দু মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষণমূলক সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের সদর্থক ও প্রগতিমূলক প্রভাব-প্রতিক্রিয়া অনস্বীকার্য। বিষয়টি শাহবানু মামলায় স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয়েছে। হিন্দু মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষণমূলক আইনগুলি প্রণীত হওয়ার প্রায় চার দশক পরে ১৯৮৫ সালে সুপ্রিম কোর্ট এক মুসলমান বিবাহ বিচ্ছিন্নার (Divorsed) ভরণপোষণ আবেদন মঞ্জুর করে। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে মুসলমান বিবাহ বিচ্ছিন্নার রক্ষণশীল অংশ প্রতিবাদে মুখর হয় এবং বিচারবিভাগীয় এই প্রতিবন্ধকতাকে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রতিক্রম করার জন্য সমকালীন রাজীব গান্ধি সরকারের উপর অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি করা হয়।

ভোটাধিকারের মতো মহিলাদের কিছু কিছু অধিকার সম্যকভাবে কার্যকর হলেও অন্যান্য অনেক আইনি অধিকার কেতাবি কথাবার্তার মধ্যে সীমাবদ্ধতা থেকে গেছে। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ব্যাপারে মহিলাদের অধিকারকে সর্বাংশে ও সম্যকভাবে কার্যকর করা হয়নি বা হয়নি। এখনও অনেক ক্ষেত্রেই মহিলারা পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারকে সাধারণত ছেড়ে দেয়। বিবাহের পর পত্নীকে পতিগৃহেই থাকতে হয়। এই অবস্থায় মেয়েরা পণের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থকে পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারের অংশ হিসাবে গণ্য করে; তাই ছাড়ে না, নিয়ে নেয়। শহরাঞ্চলের মহিলারা অধুনা বিবাহবিচ্ছেদের আইনি অধিকার ভোগ করছে। তবে বিবাহ বিচ্ছেদপ্রাপ্ত মহিলাকে এখনও ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় বেশ কিছু প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়।

পরিবর্তিত পরিস্থিতি-পরিমণ্ডল এবং অপরিবর্তিত বিচার্য বিষয়াদি : ন্যায়ের জন্য নারীজাতির এবং নির্যাতিত অন্যান্য মানবগোষ্ঠীর সংগ্রাম বিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিকতা লাভ করে। তার ফলে নারী-পুরুষের মধ্যে সাম্য সুনিশ্চিত করণের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় জাতীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক রূপান্তরের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে আন্দোলন আন্তর্জাতিক মাত্রা লাভ করে। সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে ন্যায়, সাম্য, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মূল্যবোধ, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রভৃতির ভিত্তিতে অনুকূল মতাদর্শ ও আন্দোলন সংগঠিত হয়। নিজেদের পরাধীন অবস্থানের বিরুদ্ধে নারীজাতির আন্দোলন বিভিন্ন মাত্রায় এই অন্তত কিছুর দ্বারা উজ্জীবিত হয়। নারীজাতির স্বার্থবিরোধী পরিকাঠামো ও মতাদর্শের বিরুদ্ধে আন্দোলন হলেও ছিল। কিন্তু সেই সমস্ত আন্দোলন আঞ্চলিকতা, দৃষ্টিভঙ্গির অপরিসরতা, বিচার্য বিষয়ের প্রকৃতি ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কারণে দুর্বল ছিল। তবে এই বিংশ শতাব্দীতেই আবার নিপীড়িত মানবগোষ্ঠীসমূহের বিরুদ্ধে শোষণ-পীড়নেরও বিশ্বায়ন ঘটে। এই সময় প্রাধান্যকারী শক্তিসমূহ কর্তৃত্ব কায়েম করার নতুন নতুন উপায়-পদ্ধতি আয়ত্ত করে। বীণা মজুমদার ও ইন্দু অগ্নিহোত্রী (Vina Majumdar & Indu Agnihotri) তাঁদের *The Women's Movement in India—Emergence of a New Perspective* শীর্ষক এক রচনায় মন্তব্য করেছেন : "The revolutionary changes that followed each of the world wars created some fora and structures that promoted debates and limited acknowledgement of women's rights."

নারী-আন্দোলন—পটভূমি, প্রসঙ্গ ও দৃষ্টিভঙ্গি : ঔপনিবেশিক শাসন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অধ্যায়েই ভারতের নারীজাতির মধ্যে সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে। সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সমকালীন আন্দোলন-গুলির মধ্যে একাধিক ধারা বর্তমান ছিল। কিন্তু নারীজাতির সমস্যামুক্তির বিষয়টি সকল ধারার মধ্যেই অল্পবিস্তর বিদ্যমান ছিল। স্বভাবতই স্বাধীন ভারত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য সংবিধানে ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য, সুযোগ অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে সকল পক্ষের মধ্যেই সহমত পরিলক্ষিত হয়েছে। স্বাধীন ভারতের নব সৃষ্ট রাষ্ট্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মহিলারা আর্থ-সামাজিক সচলতার উপায়-পদ্ধতি নির্ধারণের ব্যাপারে সক্রিয় হন। তাছাড়া রাজনৈতিক সচলতা, নতুন মর্যাদাপূর্ণ পরিচয় অর্জন, গঠনমূলক ভূমিকায় অভিব্যক্তি প্রভৃতি বিষয়েও সমকালীন মহিলাদের মধ্যে আগ্রহ ও সচেতনতার সৃষ্টি হয়। নেহরুর আমলের কল্যাণমূলক লক্ষ্যসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদের এই সমস্ত উদ্যোগের কিছু কিছু স্বীকৃত ও বৈধতাযুক্ত হয়। মহিলাদের এই সমস্ত আন্দোলনের কিছু নেত্রী ও সক্রিয় কর্মী সরকারি উদ্যোগ-আয়োজনের শামিল হন। এই

সময় দেশের মহিলাদের মধ্যে একটি অংশ ছিলেন যারা সাবেকি পিতৃতান্ত্রিক ঊর্ধ্বাধঃ সামাজিক স্তরবিন্যাসের মূল্যবোধের সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি এবং তাঁরা তাঁদের নতুন গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। এই শ্রেণির মহিলারা পরিবর্তিত পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেননি। এই সময় নারী-আন্দোলন হয়েছে, কিন্তু সেই সমস্ত আন্দোলনগুলি ছিল বহুধা বিভক্ত, সুসংহত নয়। তার ফলে নারীজাতির সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলি সর্বসাধারণের মধ্যে তেমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারেনি। এই সময় মহিলাদের প্রশ্নগুলি গুরুত্ব হারাতে থাকে, আন্দোলনকে উদ্দীপ্ত করতে পারেনি। তার ফলে জনসাধারণের মনে তেমন দাগ কাটতে পারেনি।

তবে একটি সদর্থক দিক হল সমকালীন ভারতে মহিলা সংগঠনসমূহ, মূল স্রোতের রাজনীতিক দলসমূহ এবং তৃণমূল স্তরের আন্দোলনসমূহ নারী জাতির স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়াদির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। এই সময় মহিলাদের উপর কিছু অন্যায়-অবিচারকে তুলে ধরা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে পণ-মৃত্যু, নারী ধর্ষণ ও মাদকাশক্তি জনিত পারিবারিক নির্যাতনের কথা বলা যায়। তবে বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে আশি ও নব্বইয়ের দশক ছাড়িয়ে বিবিধ আন্দোলন সংগঠিত হয়। এই সমস্ত আন্দোলন ছিল অনেক ক্ষেত্রেই স্থানীয়, অনেক ক্ষেত্রে বৃহত্তর অঞ্চল ব্যাপী। স্বভাবতই সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সঞ্চারিত হয়।

কৃষিজীবী, চাষি, উপজাতি, শ্রমিক এবং পরিবেশ আন্দোলনেও ভারতীয় মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। স্বভাবতই এই সমস্ত আন্দোলনের অভ্যন্তরে মহিলাদের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯৪৬-১৯৫০ সালে হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানা অঞ্চলে বামপন্থী কৃষক সংগ্রাম সংগঠিত হয়। এই সংগ্রামে মহিলারা শামিল হয়েছেন। এবং এই আন্দোলনের নেতৃবর্গ নারী নির্যাতনের মতো বিতর্কিত বিষয়গুলিকে তুলে ধরেছিলেন। বামপন্থী মহিলা সক্রিয় কর্মীরা বিভিন্ন বিষয়ে গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের সংগঠিত করেছিলেন। গ্রামাঞ্চলে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' সমূহ গঠিত হয়েছিল। বিত্ত ও সম্পত্তিতে মহিলাদের অধিকারের বিষয়টি তুলে ধরার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া বউ-পেটানোর মতো নারী নির্যাতনের বিষয়াদির উপরও জোর দেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৬-'৪৭ সালে বাংলায় তেভাগা কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়। এই আন্দোলনে মহিলারা 'নারী বাহিনী' নামে পৃথক একটি সংস্থার মাধ্যমে নিজেদের সংগঠিত করেন। তাঁরা আন্দোলনকারীদের আশ্রয় প্রদান ও যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব পালন করতেন। কিন্তু এই সময় সঠিক অর্থে তেমন কোনো মহিলা সংগঠন গড়ে ওঠেনি। সমকালীন গুপ্ত গরিলা বাহিনীতে মহিলাদের যোগদানের বিষয়টিকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। আবার কালক্রমে মহিলারা যোগ দেওয়ার পরও তাদের খোলামনে পুরোপুরি গ্রহণ করা হয়নি। কোনো কোনো অঞ্চলের বামপন্থী মহিলা সদস্যরা তখন অভিযোগও করেছেন যে, তাঁদের পুরুষ কমরেডদের বিবাহ করার ব্যাপারে বিশেষভাবে চাপ দেওয়া হয়েছে। এবং মহিলা গণ-সংগঠনসমূহের কাজ করার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ নিজেদের অধিকারের ভিত্তিতে নেতৃত্বের দাবি থেকে মহিলাদের যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে।

জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন রাজনীতিক শক্তিসমূহ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর যে যার পথে চলতে শুরু করে। এই সময় নারী-আন্দোলনও বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৫৪ সালে বামপন্থী মহিলা সদস্যরা 'সারা ভারত মহিলা সম্মেলন' (All India Women's Conference) ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এবং ভারতীয় মহিলাদের জাতীয় ফেডারেশন' (National Federation of Indian Women)— এই সংস্থাটি মহিলাদের একটি বৃহত্তর মঞ্চে পরিণত হওয়ার পরিবর্তে একটি দলীয় সংস্থায় পরিণত হয়। ভারতের সমকালীন নেত্রীদের অনেকেই নারী-কল্যাণমূলক বিবিধ কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য সরকার পরিচালিত ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রকল্পের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়েন। এই সমস্ত কর্মসূচির মধ্যে উল্লখযোগ্য হল মর্মান্তিক উদ্‌বাস্তু সমস্যার মুখে বিপন্ন উদ্‌বাস্তু মহিলাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, শহরাঞ্চলে কর্মরত মহিলাদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা, মহিলাদের জন্য কর্মপ্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের ও ষাটের দশকে উল্লেখযোগ্য কোনো

নারী-আন্দোলনের পরিচয় পাওয়া যায় না। এই কারণে অনেকে এমন কথাও বলেন যে, স্বাধীনতা লাভের পর এবং সত্তরের দশকে নতুন উদ্যোগ-আয়োজন গৃহীত হওয়ার আগে অবধি নারী-আন্দোলন কার্যত স্তিমিত ছিল। বস্তুত এই সময়ে গঠনমূলক বিবিধ কাজকর্ম নীরবে সম্পাদিত হয়েছে এবং আন্দোলনের উপাদানসমূহ সুসংহত হয়েছে। পরবর্তীকালে নারী-আন্দোলন জোরদার হয়েছে।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে নব্বইয়ের দশকের মধ্যবর্তী পর্বে ভারতীয় সমাজ, রাষ্ট্র এবং নারীজাতির আন্দোলনের অন্তর্নিহিত সক্রিয়তার ক্ষেত্রে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। নারীজাতির সমস্যাসমূহের বহু উৎস এবং সে বিষয়ে সচেতনতার ক্ষেত্রে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। নারীজাতির সম্পর্ক বিষয়ক সামাজিক কাঠামো এবং জাতীয় অর্থনীতি ও রাজনীতির সমস্যাদির সুরাহা সম্পর্কিত উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণির মহিলাদের অবস্থান মহিলাদের জীবনধারার ওপর প্রবিষ্ট হয়। এই সময় স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় নিশ্চয়তার অবসানের প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে নব্বইয়ের দশক—এই তিন দশকের সময়কালকে বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার স্বীকৃতি, নির্লিপ্ততা ও সন্তুষ্টির সমাপ্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এই সময় সমাজের নীচু তলা থেকে অভ্যুত্থানের এক উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। এই উত্থান প্রক্রিয়ার মধ্যে বৃঢ়ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণমূলক চেতনা ছিল। এসব হল ভারতীয় উপমহাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতিক্রিয়া।

সমকালীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় রূপান্তর প্রক্রিয়ায় পরস্পর বিরোধী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। (ক) এই সময় যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ ও বিস্তার ঘটে। তার ফলে ভোগবাদী জীবনধারার নির্গমপথের প্রসার ঘটে। দেশের উন্নয়নের পরিচায়ক হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু এ সবের ফলে জাতির প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ ও সামাজিক পরিবেশের উপর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে আবার স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে অসম্মতি ও প্রতিবাদ প্রকাশিত হওয়ার নির্গমদ্বার তৈরি হয়। (খ) এই সময় পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে নারী নির্যাতনমূলক অপরাধের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণির নারী-পুরুষ এই সময় বিভিন্ন সাহসী সংগ্রামে শামিল হয়েছে। সমকালীন সমাজের অধি-ব্যাধির বিরুদ্ধে গঠনমূলক সমাধানের পথ অনুসন্ধানে মানুষ আত্মনিয়োগ করেছে। (গ) এই সময় এক দিকে শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত বিকাশ ঘটে এবং অপরদিকে অসাম্য-বৈষম্য, দারিদ্র্য নিরক্ষরতার হার বাড়তে থাকে। নিরক্ষরদের মধ্যে মহিলা ও শিশুরাই হল তিন-চতুর্থাংশ।

বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে ভারত সরকারের বৈধতা ও দক্ষতা প্রসঙ্গে প্রশ্ন দেখা দেয় ও ব্যাপক আন্দোলন সংগঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধি জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। লোকসভা নির্বাচনে কর্তৃত্বমূলক শাসনের অবসান ঘটে এবং জনপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় সরকারের কার্যপ্রক্রিয়ার মৌলিক পরিবর্তনের ব্যাপারে দেশব্যাপী বিভিন্ন ধরনের গণ-আন্দোলন পরিচালিত হয়। এই সময় বিভিন্ন নারী-আন্দোলনও সংগঠিত হয়। এই সব আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ নাগরিক হিসাবে রাজনীতিক ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সমানভাবে মহিলাদের অংশগ্রহণের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা। এই সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে কতকগুলি ছিল গণতন্ত্রের উপর আস্থাশীল এবং কিছু আন্দোলন ছিল বহুলাংশে জঙ্গী প্রকৃতির।

বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে রাজনীতিক সমরূপতার বিকাশ ঘটে এবং রাজনীতিক উদ্দেশ্যে হিংসার ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। এই সময় সরকারি ব্যবস্থার নেতৃত্ব ও দক্ষতা এবং সরকারের উপর আস্থার ব্যাপারে সংকটের সৃষ্টি হয়। আন্তর্জাতিক আর্থনীতিক ও রাজনীতিক ব্যবস্থায় ভারতের অবস্থানের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সরকারের অক্ষমতার কারণে সরকারের প্রতি অনাস্থা বৃদ্ধি পায়। নব্বইয়ের দশকেও এই সমস্ত সংকটের অভিব্যক্তি দেখা যায়। এই দশকে রাজনীতিক ক্ষেত্রে রক্ষণশীল এবং আর্থনীতিক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের উত্থান ঘটে। এই সমস্ত শক্তি স্থিতাবস্থা বজায় রাখার বা নিম্নবর্গের উত্থান বা মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণের পক্ষপাতী ছিল না। তারা বরং মৌলবাদী ধ্যান-ধারণার অভ্যুত্থানের ব্যাপারে আন্তরিক ছিল। এই সময় সরকারি কাঠামোর মধ্যে

পরস্পর বিরোধিতা এবং প্রকৃতিগত পরিবর্তনের কারণে নারী-আন্দোলনের প্রতি ধারণার ক্ষেত্রে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। রাজনীতিক কর্মসূচিতে মহিলাদের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়াদিকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে মহিলাদের দাবি ও আন্দোলনের প্রতি প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের ব্যাপারে সমকালীন সরকারসমূহকে সতর্ক ও সক্রিয় হতে দেখা যায়।

বিংশ শতাব্দীর উল্লিখিত তিনটি দশকে নারী-আন্দোলনের বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়। অনেকের অভিমত অনুসারে সত্তরের দশকটি হল নারী-আন্দোলনের পুনর্জাগরণের পর্ব। এই সময় ক্রমান্বয়ে নারী-আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। কখনো একেবারে স্থানীয় পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কখনো ক্রমবর্ধমান জাতীয় সংকটের মুখে, আবার কখনো আন্তর্জাতিক নারী-আন্দোলনের অংশ হিসাবে নারী-আন্দোলন সংগঠিত হয়। নারী-আন্দোলনের এই পটভূমিগত বৈচিত্র্যের কারণে আন্দোলনের মধ্যে বিভিন্ন মতাদর্শগত সংঘাত, বিচ্ছিন্নতা এবং আঞ্চলিকভাবে আন্দোলনের অসম বিকাশ পরিলক্ষিত হয়।

আশির দশকে সংগঠন গড়ে তোলা, সমঝোতা ও জোট গঠন করা এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সম্পর্কসমূহের জন্য আন্দোলনের সমরূপতা, উদ্দেশ্যসমূহ ও কৌশলসমূহ নির্ধারণ করা প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক নারীর আর্থনীতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আন্দোলনের স্বাধীন অবস্থানের জন্য সকল রকম মৌলবাদী নীতির নারী-বিরোধী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী কাজকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে হয়। এই সময় নারী-আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যের অবসানের ক্ষেত্রে সরকারি নীতি ও উন্নয়নমূলক কলা-কৌশলের ব্যর্থতার সমালোচনা; শহর ও গ্রামাঞ্চলে তৃণমূল স্তরের দরিদ্র মহিলাদের আন্দোলনের ভিত্তিস্বরূপ বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থীবদ্ধকরণ; এবং দরিদ্র মহিলাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, উদ্যোগ-আয়োজন ও স্বার্থকে আন্দোলনের পরিধির অন্তর্ভুক্ত করা প্রভৃতি।

নব্বইয়ের দশকে রাজনীতিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের দ্রুত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এই সময় নারী-আন্দোলনের সঙ্গে বিভ্রান্তিমূলক ও ত্বরিত অবস্থার উপাদান সংযুক্ত হয়। এই সময় পর্যন্ত আন্দোলন নিস্তেজ হয়ে পড়েনি। কারণ হিসাবে বলা যায় যে, তৃণমূল স্তরে ব্যাপকভাবে মহিলাদের মধ্যে আন্দোলনের ভিত্তিভূমি গড়ে উঠেছিল। তাছাড়া ইতিমধ্যে নারী-আন্দোলন ব্যাপক উদ্দেশ্যযুক্ত ও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী প্রকৃতির হয়েছিল। নির্দিষ্ট কোনো দাবির মধ্যে আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল না। তবে আন্দোলনের মূল বরাবরই গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহের মধ্যেই নিহিত ছিল। নারীজাতির গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহের উপরই সব সময়ই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সত্তরের দশকের শেষের দিক থেকে বড়ো বিষয় হিসাবে নারী-আন্দোলনের সঙ্গে হিংসা ক্রমান্বয়ে অধিকমাত্রায় সংযুক্ত হতে থাকে। রাষ্ট্র এবং সমাজের অন্যান্য স্তরের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে আন্দোলন আইনমূলক, শিক্ষামূলক ও রাজনীতিক প্রক্রিয়ার দিকে অধিকমাত্রায় ঝুঁকতে থাকে। এর উদ্দেশ্য হল পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে সাম্য ও অংশগ্রহণমূলক ক্ষমতা অর্জনের অভিমুখী করা।

উল্লেখযোগ্য আন্দোলনসমূহ : বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষের দিকে এবং সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে ভারতে এক নতুন রাজনীতিক আবহাওয়া ও প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এই সময় কিছু নতুন ধরনের রাজনীতিক আন্দোলন সংগঠিত হতে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলন, নক্‌শাল আন্দোলন, চিপকো আন্দোলন, মূল্যবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত আন্দোলনের কোনোটিকেই সরাসরি নারী-আন্দোলন হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। একথা ঠিক। কিন্তু ব্যাপক সংখ্যায় মহিলাদের অংশগ্রহণের কারণে সংশ্লিষ্ট আন্দোলনসমূহ স্বতন্ত্র মাত্রা লাভ করেছিল এবং মহিলাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস দেখা দিয়েছিল ও স্বাধীনতাসূচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। তার ফলে পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্ব ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে অধিকতর জটিল প্রকৃতির আন্দোলনের শামিল হওয়ার ব্যাপারে মহিলাদের মধ্যে সামর্থ্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

১৯৭৩-'৭৫ সালে মহারাষ্ট্রের শহরাঞ্চলে কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রী মহিলারা মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী

আন্দোলন সংগঠিত করেন। হাজারে হাজারে গৃহবধূ প্রকাশ্য মিছিলে যোগ দেন। যাঁরা ঘর ছেড়ে মিছিলে শামিল হতে পারেননি, তাঁরা থালা বাজিয়ে সমর্থন জানান। এই আন্দোলন অচিরেই গুজরাটে ছড়িয়ে পড়ে। গুজরাট আন্দোলনের শামিল হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে গুজরাটে কাপড় কলের শ্রমিক সংস্থা (Textile Labour Association)-এর দ্বারা প্রভাবিত 'নব নির্মাণ' এই আন্দোলন জয়প্রকাশ নারায়ণের 'পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব' (Total Revolution)-এর দ্বারা প্রভাবিত 'নব নির্মাণ' Women's Association) নামে প্রাচীন এক গান্ধিবাদী সংগঠন হিসাবে এই সংস্থাটি গড়ে ওঠে এবং কাপড় কলের শ্রমিক সংস্থার সঙ্গে যাবতীয় সংযোগ সম্পর্ক ছিন্ন করে। মহিলাদের এই সংগঠনটি অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত মহিলাদের সংগঠিত করে এবং ইউনিয়ন গড়ে তোলে। এই সংগঠনটি অসংগঠিত মহিলাদের প্রশিক্ষণ ও ঋণের ব্যবস্থা করে এবং সমষ্টিগতভাবে দরকষাকষির সুযোগ করে দেয়। স্বনিযুক্ত মহিলা সংস্থার এই আন্দোলন কালক্রমে দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, ভূপাল, ইন্দোর প্রভৃতি শহরে ছড়িয়ে পড়ে। মহিলাদের এই আন্দোলন যথেষ্ট সাফল্য লাভ করে। সাম্প্রতিককালেও ইলা ভট্ট (Ela Bhatt) প্রমুখ বিশিষ্ট নেত্রীর পরিচালনায় এই আন্দোলন যথেষ্ট সক্রিয়।

সত্তরের দশকে নারী-আন্দোলনের আর একটি ধারা পরিলক্ষিত হয়। এই ধারাটি মহিলাদের স্বশাসনিক গোষ্ঠী বা স্বশাসিত সংগঠন (Autonomous Women's Organization) হিসাবে চিহ্নিত হয়। স্বশাসনিক মহিলা সংগঠন বলতে সেই সমস্ত সংগঠনকে বোঝায় যেগুলি কোনো রাজনীতিক দলের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। লক্ষ্মী লিনগম (Lakshmi Lingam) তাঁর *Taking Stock : Women's Movement and the State* শীর্ষক রচনায় [(Ghanashyam Shah(ed.) Social Movement and State] বলেছেন : "The autonomous women's movement is an integral part of the broader non-party movement sector in India that emerged in the early 1970s and blossomed in the wake of the internal emergency in 1975" সত্তরের দশকের মাঝামাঝি মহিলাদের এরকম স্বশাসনিক গোষ্ঠী শহরাঞ্চলে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠে। এ রকম গোষ্ঠীসমূহের অন্তর্ভুক্ত মহিলাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যাঁরা মাওবাদী বা নক্‌শালপন্থী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন বা এ ধরনের আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এ রকম কয়েকটি গোষ্ঠী হল ১৯৭৪ সালের হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রগতিশীল মহিলাদের সংগঠন' (Progressive Women's Organization), ১৯৭৫ সালের পুনের 'পুরগামী স্ত্রী সংগঠন' ও বোম্বাই (মুম্বাই)-এর 'স্ত্রীমুক্তি সংগঠন' প্রভৃতি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ১৯৭৫ সালটিকে আন্তর্জাতিক নারী বৎসর হিসাবে ঘোষণা করে। অনেকের অভিমত অনুসারে এই কারণে ১৯৭৫ সাল মহারাষ্ট্রে দলভিত্তিক ও স্বশাসনিক সংগঠনসমূহ মার্চ মাসের ৮ তারিখটিকে প্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে উদ্‌যাপন করে। অক্টোবর মাসে পুনে শহরে একটি মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সমগ্র রাজ্যের মহিলারা অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ মহিলাই ছিলেন বিভিন্ন মাওবাদী ও সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠীসমূহের সঙ্গে অথবা রিপাবলিকান পার্টি, লাল নিশান পার্টি বা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত।

১৯৭২ সালে মহারাষ্ট্রের ধুলিয়া জেলার শাহাদা উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে উপজাতীয় রমণীদের মদ্যপান বিরোধী এক আন্দোলন সংগঠিত হতে দেখা যায়। এই আন্দোলন প্রাথমিক পর্যায়ে পরিচালিত হয়েছে গান্ধিবাদী সর্বোদয় কর্মীদের দ্বারা এবং পরবর্তীকালে মাওবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা। প্রথমে খরাত্রাণের উদ্দেশ্যে এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ভিল-উপজাতির মহিলারাই এই আন্দোলনের প্রথম সারিতে ছিলেন। এই আন্দোলন মদ্যপান বিরোধী জঙ্গী আন্দোলনে পরিণত হয়। বউপেটানোর মূল কারণ হিসাবে উপজাতি রমণীরা মদ্যপানকেই চিহ্নিত করে এবং মদের ডেরাগুলিতে সম্মিলিতভাবে হাজির হয়ে মদের পাত্রগুলিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বউ পেটানোর অপরাধে অপরাধীদের প্রকাশ্যে শাস্তির ব্যবস্থা করে। এ ধরনের আন্দোলন মাঝে মাঝে বিভিন্ন জায়গায় মহিলাদের দ্বারা সংগঠিত হয়। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি মদ্যপান বিরোধী একটি জোরদার আন্দোলন সংগঠিত হয়। মূলত গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মহিলারাই এই প্রতিবাদী আন্দোলনে শামিল হয়। সাম্প্রতিককালে বিচ্ছিন্নভাবে মহিলাদের এ ধরনের আন্দোলনের খবরাখবর পাওয়া যায়।

১৯৭৪ সালে উত্তরপ্রদেশের উত্তরাখণ্ডের চিপকো আন্দোলন নারী-আন্দোলনের আর একটি বড়ো উদাহরণ। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে কাঠ ব্যবসায়ীরা নির্বিচারে গাছ কেটে বনাঞ্চল ধ্বংসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। মহিলার বনাঞ্চল সংরক্ষণের ব্যাপারে সংগঠিতভাবে এগিয়ে আসে। গাছগুলোকে রক্ষার ব্যাপারে তারা প্রতিবাদী আন্দোলন সংগঠিত করে। পরিবেশ সংরক্ষণের সহায়ক প্রথম বৃহৎ আন্দোলন হিসাবে চিপকো আন্দোলন প্রসিদ্ধি লাভ করে। এবং এই আন্দোলনের সুবাদে এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, প্রকৃতির পরিচর্যার ব্যাপারে নারীজাতির বিশেষ প্রবণতা ও অনুকূল ভূমিকা আছে। বলা হয় যে, পরিবেশ সংরক্ষণের সঙ্গে নারীজাতির স্বার্থ সংযুক্ত। কারণ পরিবেশের অবক্ষয়ে দুর্ভোগ-দুর্গতি অধিক হয় মহিলাদের। বনাঞ্চল ধ্বংস হলে জ্বালানি জোগাড় করতে ও জল আনতে মহিলাদের দূরবর্তী অঞ্চলে যেতে হয়।

১৯৭৭ সালের জরুরি অবস্থার পর নারী-আন্দোলনের ক্ষেত্রে আর এক ধরনের উদ্যোগ-আয়োজন পরিলক্ষিত হয়। দিল্লির মহিলাদের একটি গোষ্ঠী নারী-আন্দোলনের অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করে। 'মানুষী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। নারী-আন্দোলন সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাদি, তথ্যাদির পর্যালোচনা প্রভৃতি নিয়মিতভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। নারী-আন্দোলনের ইতিহাস, আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারীদের বক্তব্য এবং আনুষঙ্গিক অনেক কিছু সুবিন্যস্ত ভাবে এবং স্থায়ী তথ্য হিসাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। নারী-আন্দোলনের মুখপত্র হিসাবে এই নির্ভীক প্রকাশনা মধু কিশওয়ার (Madhu Kishwar)-এর যোগ্য নেতৃত্বে অব্যাহত আছে।

১৯৭৭ সালে মধ্যপ্রদেশের ছত্তিশগড়ের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় 'ছত্তিশগড় খনিশ্রমিক সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিলাই স্টিল প্ল্যান্টের যান্ত্রিকীকরণের কর্মসূচির বিরুদ্ধে জঙ্গী আন্দোলন সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। মনে করা হয় যে, যান্ত্রিক করার নীতি বাস্তবে রূপায়িত হলে ভিলাই স্টিল প্ল্যাটে মূলত মহিলাদের কাজকর্ম ও নিয়োগ বিশেষভাবে ব্যাহত হবে। কর্মপ্রার্থী উপজাতি মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে 'মহিলা মুক্তি মোর্চা' গঠিত হয়।

১৯৭১ সালে বিহারে 'ছাত্র যুব সংঘর্ষ বাহিনী' গঠিত হয়। বিহারের বুদ্ধগয়ায় মন্দিরের পুরোহিতদের বিরুদ্ধে খেতমজুরদের স্বার্থ সংরক্ষণমূলক আন্দোলনকে মদত দেওয়ার জন্য এই বাহিনী সক্রিয় হয়। এই আন্দোলনে সংগ্রামী মহিলা ও সাধারণ মহিলারা ব্যাপক সংখ্যায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। দাবি করা হয় যে, মহিলাদের নামেও জমিজমা রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধীকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই ধারণার ভিত্তিতেই বিভিন্ন রাজ্যে মহিলাদের নামে জমির পাট্টা প্রদানের ব্যবস্থা হয়।

পণপ্রথা ও পণ-মৃত্যু প্রভৃতির বিরুদ্ধে মহিলাদের সংগ্রাম ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ১৯৭৯ সাল থেকে পণ-ব্যবস্থা সম্পর্কিত নারী-নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে প্রতিবাদী আন্দোলন সংগঠিত হয়। জনতা পার্টির মহিলারা 'মহিলা দক্ষতা-সমিতি' গঠন করেন। এই সমস্ত মহিলাদের অধিকাংশই সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা পণবিরোধী আন্দোলনের আয়োজন করেন। দিল্লির 'স্ত্রী সংঘর্ষ'-ও সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনের শামিল হয়। পণ বিরোধী পথসভা, মিটিং-মিছিল ও পথ-নাটিকার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন জায়গায় ধরনা ও বিক্ষোভ অবস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। সর্বোপরি আইনী সংস্কারমূলক পদক্ষেপ দাবি করা হয়। তাছাড়া ঘরে ঘরে পণবিরোধী প্রচারের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির 'জানওয়াদি মহিলা সমিতি', 'সর্বভারতীয় গণতান্ত্রিক মহিলা সংঘ' প্রভৃতি মহিলা সংগঠনের সক্রিয় ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬১ সালের পণপ্রথা বিরোধী আইন সংশোধনের জন্য একটি বিল সংসদে উত্থাপিত হয়। বিলটিকে যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হয়। বিভিন্ন মহিলা সংগঠন এই কমিটির প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পেশ করে। ১৯৮৪ সালে পণ সম্পর্কিত অপরাধের বিরুদ্ধে আগের আইনটিকে সংশোধন করে একটি কড়া আইন প্রণীত হয়।

আশির দশকের মাঝামাঝি মহারাষ্ট্রে শেতকারী সংগঠনের মহিলা শাখা হিসাবে 'সমগ্র মহিলা অঘাদি'-র আবির্ভাব ঘটে। ১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাসে এই মহিলা সংগঠনটির একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

হয়। লক্ষাধিক মহিলা এই সম্মেলনে যোগ দেন। এই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, সমাজের অন্যান্য অংশের থেকে নারীজাতির উপরই রাজনীতির নির্যাতন অধিক। এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়। তাছাড়া মহারাষ্ট্রের সকল পঞ্চায়েত ও জেলাপরিষদ নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীর প্যানেল প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৮৪ সালে ইউনিয়ন কারবাইড কারখানায় রাসায়নিক বিষাক্ত গ্যাস লিক দুর্ঘটনার শিকার হন বহু মানুষ। ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গত মানুষগুলির জন্য ন্যায়বিচারকে নিশ্চিত করার জন্য মহিলারা আন্দোলন সংগঠিত করেন। এক্ষেত্রে 'ভূপাল গ্যাস পীড়িত মহিলা উদ্যোগ সংগঠন' সদর্থক ভূমিকা পালন করে।

১৩.১৩ নারী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা (Limitations of Women's Movement)

সামগ্রিক বিচারে নারী-আন্দোলন অতিমাত্রায় জটিল প্রকৃতির। স্বভাবতই অনুধাবন ও বিচার- বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিতে বাধ্য। ওই কারণে কার্যক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান বাছাই ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

অন্যান্য অধিকাংশ আন্দোলনের মতো নারী আন্দোলনও প্রকৃতিগত বিচারে সমরূপ বা এককেন্দ্রিক প্রকৃতির নয়। এই আন্দোলন বিভিন্ন শ্রেণির প্রক্রিয়াযুক্ত এবং বহু স্তরবিশিষ্ট। নারী-আন্দোলনের অভিব্যক্তি ঘটেছে বহু সংগঠনের মাধ্যমে। এই সমস্ত মহিলা সংগঠনের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। মহিলা সংগঠনসমূহের মতাদর্শ ও কার্যপ্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ক্ষমতা ও কর্তৃত্বপূর্ণ পদ-প্রাপ্তির ব্যাপারে পশ্চিমের মতো এ দেশেও মহিলাদের আগ্রহ ও দাবি বাড়তে থাকে। স্বাধীন ভারতে সহজেই অনেক মহিলাই উচ্চ পদে আসীন হন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি ভারতের প্রবল পরাক্রান্ত প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ইতিহাসে জায়গা করে নেন। বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে অধিক সংখ্যায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের দাবিকে কেন্দ্র করে নতুন আন্দোলন দানা বাঁধে। তৃণমূল স্তর থেকে নারীজাতির নতুন নেতৃত্ব তুলে আনার জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থাসমূহে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু রাজ্য বিধানসভায় বা সংসদে এ ধরনের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়নি। অবশ্য এ বিষয়ে জাতীয় স্তরে উদ্যোগ-আয়োজন অব্যাহত। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি মতৈক্যে উপনীত হতে পারেনি।

ভারতে নারী আন্দোলন হল মূলত একটি রাজনীতিক আন্দোলন। কিন্তু এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী অনেকেই এ কথা মানতে প্রাথমিকভাবে দ্বিধান্বিত ছিলেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিস্থিতি- পরিমণ্ডলের পরিবর্তন বারে বারে নারী-আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে। তবে এই প্রভাব বা তার প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে মতপার্থক্য বা বিতর্কের অবকাশ আছে।

বিংশ শতাব্দীর সত্তর, আশি ও নব্বই—এই তিন দশকে আপাত বিচারে নারীজাতির স্বার্থের সপক্ষে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি, সম্পদের বণ্টন, আইনকানুন, সাংগঠনিক ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বাস্তবে এই সব পরিবর্তনের বেশ কিছু কার্যকর করা হয়নি। তার ফলে মহিলাদের সামাজিক অবস্থান, ভূমিকা ও মর্যাদার তেমন কোনো অর্থবহ উন্নয়ন ঘটেনি। স্বভাবতই এই সমস্ত পরিবর্তনকে নারীজাতির মনোন্নয়নমূলক সার্থক বা সফল পদক্ষেপ হিসাবে স্বীকার করা অতিশয়োক্তির শামিল। এ রকম আপাত সদর্থক ও ক্ষণকালস্থায়ী বেশ কিছু পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা এ দেশের নারী-আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত। এ ধরনের পরিবর্তন বহুবিধ বাহ্যিক উপাদানের উপর নির্ভরশীল। এই সমস্ত উপাদানই সমালোচনার যোগ্য।

অনেক সময় নারী-আন্দোলনের লক্ষ্যকে জাতির বৃহত্তর স্বার্থের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার-বিবেচনা করা হয়। পরিবেশ, জনসংখ্যা, বিশ্বায়ন, বাজার অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক ঋণ প্রভৃতি জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং বিতর্কিত বিষয়াদিকে নারী-আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত; নাকি নারীজাতির স্বাতন্ত্র্য ও সংকীর্ণ স্বকীয়

স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়াদির মধ্যে নারী-আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকবে, সে বিষয়ে মতানৈক্য বর্তমান। জাতীয় জীবনের কিছু কিছু পরিবর্তন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পরিবর্তন সূচিত করে। কিন্তু এই সমস্ত রূপান্তরমূলক পরিবর্তনকে বড়ো একটা স্বীকার, সমর্থন বা তুলে ধরা হয় না। অথচ এই সমস্ত পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব-প্রতিক্রিয়াকে অস্বীকার করা যায় না।

ভারতের লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী দরিদ্র মহিলাদের কল্যাণসাধনমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে প্রকাশিত হয় তাদের অস্তিত্ব, সাম্যভিত্তিক স্বীকৃতি, পারিবারিক ও জাতীয় অর্থনীতিতে তাদের অবদানের স্বীকৃতি। নিজেদের উৎপাদনে ও উন্নয়নমূলক সম্পদসমূহে তাদের অধিকার এবং তাদের জীবনকে স্পর্শ করে এমন সব নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে নারী জাতির মতামত জ্ঞাপন সম্পর্কিত সমস্যাদি। ভারতীয় পটভূমিতে বিশেষত উন্নয়নমূলক রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে নারীজাতির স্বার্থজড়িত বিষয়াদি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে এ হল এক প্রক্রিয়ার সূচনামাত্র।

মহিলাদের উপর হিংসাশ্রয়ী ও অপরাধমূলক আচরণ বৃদ্ধির ঘটনা কিছুকাল যাবৎ বিশেষভাবে প্রচার পাচ্ছে। নারী ধর্ষণ, বধূ নির্যাতন, পণ-মৃত্যু প্রভৃতি নারী দেহের উপর অত্যাচার আন্দোলনের কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ভারতে মহিলাদের জীবনের অধিকারের উপর আক্রমণের ঘটনার থেকে পণ-মৃত্যুর ঘটনার বিরুদ্ধে আন্দোলনের আধিক্য অনস্বীকার্য। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দু-তিনটি দশক জুড়ে পণপ্রথাকে নারীজাতির ব্যক্তিসত্তার বিরুদ্ধে অমর্যাদামূলক ও অবমাননাকর প্রথা হিসাবে প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রতিবাদী নারী-আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সত্তর, আশি ও নব্বইয়ের দশকে নারী, শিশুকন্যা ও কন্যাভ্রূণ হত্যার পিছনে যুক্তিপূর্ণ কারণ হিসাবে পণপ্রথাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। আবার এই পণকে কেন্দ্র করে পরিবার-সমূহের মধ্যে, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে, চিকিৎসা ও অন্যান্য পেশাজীবীদের মধ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণমূলক বিবিধ সরকারি নীতিসমূহের মধ্যে অস্বচ্ছ বা ষড়যন্ত্রমূলক কাজকর্ম পরিলক্ষিত হয়। আগের দিনে পণ প্রথা সমাজের শত্রু এবং উত্থানশীল আর্থনীতিক শক্তিসমূহের ও গুপ্ত বাহ্যিক প্রভাবসমূহের হাতিয়ার হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীদের অনেকের অভিমত অনুসারে অধুনা পণপ্রথাকে বহুলাংশে ছোটোখাটো ব্যাবসা ও আর্থনীতিক উদ্যোগের জন্য মূলধনের উৎস হিসাব ব্যবহার করা হয়।

সাম্প্রতিককালে রাজস্থানে 'সতীদাহ' প্রথার ঘটনা নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা গভীরভাবে অনুসন্ধান ও বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। ভারতে সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা যখন ক্রমবর্ধমান এবং রাজনীতিক সমরূপতার সমস্যা এবং সরকারের সীমাবদ্ধতা প্রকট, তখনই এ রকম একটা ঘটনা বিশেষ একটি মাত্রা লাভ করেছে। এবং ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে এর সম্পর্ক তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিচার করলে ভারতের রাজনীতিক আন্দোলন ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে বিষয়টির তাৎপর্য হ্রাস পায়। জনজীবনের বিভিন্ন বিষয়াদির মধ্যে সম্পর্কের ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার এই জটিল প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে নারী-আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রসমূহ, আন্দোলনের ক্রিয়াকেন্দ্রের, কর্মসূচির ও গুরুত্বের বিচারে অগ্রাধিকারের পরিবর্তন পর্যালোচনা করা হয়।

আলোচ্য পর্বের নারী-আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল প্রতিবাদের রাজনীতি। এবং এই প্রতিবাদী রাজনীতির সঙ্গে প্রায়শই সহজ-সরলভাবে সংযুক্ত ছিল দাবি-দাওয়া ও সুপারিশের রাজনীতি। আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত কোনো কোনো গোষ্ঠী তাদের মৌলিক মতাদর্শ হিসাবে এই ধারণা পোষণ করে যে, রাষ্ট্র এবং তার উপব্যবস্থাসমূহ পীড়নমূলক ও শোষণমূলক। সুতরাং রাষ্ট্র ও উপব্যবস্থাসমূহের মাধ্যমে জনসাধারণের দাবি-দাওয়া পূরণ হওয়ার আশা করা যায় না। এতদ্‌সত্ত্বেও বিবিধ দাবি-দাওয়ার গ্রন্থীকরণ ও উত্থাপন অব্যাহত থেকেছে। আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত এই সমস্ত গোষ্ঠী অন্যান্য রাজনীতিক গোষ্ঠী আন্দোলনের থেকে নারী-আন্দোলনের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার দাবি করে। এই কারণে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, আন্দোলনের মধ্যে দুটি ধারা বহমান ছিল। আন্দোলনের একটি ধারা স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকারের নীতিতে বিশ্বাসী ছিল এবং অন্য ধারাটি ছিল অন্যান্য আন্দোলনের সঙ্গে শ্রেণিভুক্তির নীতিতে বিশ্বাসী। অনেকে নারী আন্দোলনের প্রথম শ্রেণির অংশগ্রহণকারীদের 'নারীবাদী' (feminist) হিসাবে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী।

আন্দোলনকারীদের অবশিষ্ট অংশ অধিকতর ব্যাপকভাবে অর্থবহ ধারণা 'নারী-আন্দোলন' পদটি ব্যবহার করার পক্ষপাতী। বীণা মজুমদার ও ইন্দু অগ্নিহোত্রী মন্তব্য করেছেন : "Often there is agreement on the formulation of demands or short-term tactics while differences in perspective remain in view of long-term visions and the choice of options based on ideological frames."

সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, নারী-আন্দোলনের শক্তি-সামর্থ্যের অনেকটাই সাময়িককালের জন্য ব্যয়িত হয়ে গেছে পণপ্রথা-বিরোধী ও ধর্ষণ-বিরোধী আন্দোলনে। ১৯৮৫-৮৬ সালে শাহবানু মামলায় নারীজাতির মধ্যে প্রয়োজনীয় সংহতি ও উদ্যোগ দেখা যায়নি। অবশ্য শাহবানুর মামলার বিষয়টি নারীজাতির কাছে অনেকাংশে অস্বচ্ছ ছিল। কারণ সমগ্র বিষয়টি সামগ্রিকভাবে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার বাতাবরণে ঝাপসা ছিল। নারীজাতির অধিকারের বিষয়টি থেকে প্রাধান্য পেয়েছিল মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গি। আবার হিন্দু মৌলবাদীরা মুসলমান মহিলাদের অধিকারের ব্যাপারে অতিমাত্রায় সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েছিলেন। এ রকম অবস্থায় নারী আন্দোলনের কর্ণধাররা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণকারীরা বিভ্রান্ত ও অসহায় বোধ করেছিলেন।

নারী-আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বেশ কিছু স্বশাসিত মহিলা গোষ্ঠী ছিল। এই সমস্ত গোষ্ঠী আশির দশকের দিকে গণ-আন্দোলনের পথ থেকে সরে আসে। তার পরিবর্তে এই গোষ্ঠীগুলি অন্যবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে আইনি সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান; পরামর্শ-সহায়তা কেন্দ্র পরিকল্পনা; প্রাসঙ্গিক নথিপত্র সংরক্ষণ ও গবেষণার কার্য পরিচালনা; প্রকাশনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত গোষ্ঠী সম্ভবত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে আইনমূলক সংস্কার সাধনের পথে নারী জাতির মৌলিক সমস্যাসমূহের সম্যক সমাধান সম্ভব নয়।

আবার দিল্লির 'সহেলী' প্রমুখ মহিলা গোষ্ঠী মনে করে যে, নারীজাতির শুধুমাত্র সমস্যাগুলিকেই তুলে ধরাটা যথেষ্ট নয়; তাদের আনন্দ-বিনোদনের বিষয়াদিও বিচার-বিবেচনা করা দরকার। নাচ, গান ও বিবিধ শিল্পকলার মাধ্যমে মহিলাদের মনোজগতের অভিব্যক্তির ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কোনো কোনো মহিলা গোষ্ঠী নারীজাতির স্বার্থ সম্পর্কিত বহু পত্র-পত্রিকা প্রকাশনায় আত্মনিয়োগ করে। এই সমস্ত পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে নারীদেহকে মূলধন করে অশ্লীল বিজ্ঞাপন ও চলচ্চিত্রে অশ্লীলতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূলক রচনা, মহিলাদের স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতামূলক রচনা, ভ্রূণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূলক রচনা, কন্যাসন্তানের অধিকার সম্পর্কিত রচনা, বস্তিবাসী মহিলাদের সুস্থ পরিবার জীবনের অধিকার সম্পর্কিত রচনা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। বিপান চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জি ও আদিত্য মুখার্জি তাঁদের *India After Independence* শীর্ষক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : "Clearly, the movement had entered another phase of institutionalisation and consolidation as it had in the early fifties, and what appeared to some activities as a watering down of the movement was more likely diffusion of its ideas into the wider society which was bound to be accompained by some dilution of its sharp ideological content."

নারী-আন্দোলনের অন্যতম সীমাবদ্ধতা হিসাবে লক্ষ্য, কৌশল এবং পদ্ধতির ক্ষেত্রে ঐকমত্যের অভাবের কথা বলা হয়। তাছাড়া সাম্প্রদায়িকতামূলক চেতনার সীমাবদ্ধতাও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই কর্মসূচিভিত্তিক সমঝোতা বা সহমত সৃষ্টির পরিবর্তে তাৎক্ষণিক সমস্যাদির মোকাবিলার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আবার এমন অভিযোগও উত্থাপিত হয় যে, আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের একটি অংশ কোনো কোনো বিদেশী সংগঠনের সঙ্গে আর্থিক সম্পর্কের বাধ্যবাধকতায় জড়িয়ে পড়ে এবং আন্দোলনের কর্মসূচি থেকে সরে এসে সংশ্লিষ্ট বিদেশী সংগঠনের স্বার্থ সাধনে আত্মনিয়োগ করে। এই সময় নিছক কিছু তাত্ত্বিক বিষয়কে নিয়ে একত্রে পাকিয়ে ওঠা বিতর্কে কিছু নারীবাদকে শক্তি ক্ষয় করতে দেখা যায়। এর থেকে উপরিউক্ত অভিযোগের সারবত্তা সম্পর্কে প্রত্যয় জন্মায়।

তাছাড়া শহুরে শিক্ষিত মহিলা গোষ্ঠীসমূহের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিতদের এবং গ্রাম

ও শহরের দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে বরাবরই একটা ব্যবধান ছিল। তবে অনেক ক্ষেত্রেই এই ব্যবধান কমে এসেছিল।

আবার এমন কথাও বলা হয় যে, বিংশ শতাব্দীর তিরিশের ও চল্লিশের দশকে নারী-আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে চেতনা এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নিজেদের সামর্থ্য সম্পর্কে যে সচেতনতা ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে, পরবর্তীকালে বা সত্তরের দশক থেকে সেই প্রাণ-চাঞ্চল্য পাওয়া যায়নি। বিপান চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জি ও আদিত্য মুখার্জি মন্তব্য করেছেন : "The sense of achievement that was no palpable in the thirties and forties, when the leaps in empowerment and consciousness were huge, was missing as one looked at the women's movement since the seventies."

১৩.১৪ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন (Review and Evaluation)

ভারতের অধিকাংশ প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে লৌকিক জগতে নারী-পুরুষের সাধারণভাবে সমমর্যাদার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব জগতে মহিলারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমমর্যাদা ভোগ করেন না। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, মধ্যযুগের সময় থেকে সামাজিক ক্ষেত্রে পুরুষ জাতি ও সামাজিক কর্তৃত্বের কাছে নারীজাতিকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। সাবেকি মুসলমান ব্যক্তিগত আইনে এবং পরিমার্জিত হিন্দু ব্যক্তিগত আইনে বিবাহ-বিচ্ছিন্ন মহিলাদের উত্তরাধিকারের সমানাধিকার এবং ভরণপোষণের অধিকার স্বীকৃত। কিন্তু সংশ্লিষ্ট অধিকারসমূহ অনেকাংশে কাগুজে অধিকারের মধ্যেই থেকে গেছে। কারণ এই সমস্ত অধিকারকে বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকর করার অর্থবহ ব্যবস্থা নেই এবং পৈত্রিক সম্পত্তির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিভাজন প্রতিহত করার ক্ষেত্রে উদ্যোগ-আয়োজন পরিলক্ষিত হয়। শ্রমজীবী মহিলাদের জন্য শারীরিক পরিশ্রমের কাজ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির মহিলাদের জন্য চাকরিবাকরির ব্যবস্থা করতে পারলে নারীজাতিকে শক্তি জোগানো সম্ভব হবে।

আধুনিককালে নারী আন্দোলন এবং সংশ্লিষ্ট মতাদর্শসমূহ সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। জাতি ও সমাজের উন্নয়ন সম্পর্কিত আলোচনায় আজকাল নারী জাতির উন্নয়নের বিষয়টি বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়। তবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় নবজাগরণের মধ্যে নারীজাতির সমানাধিকারের বিষয়টির উদ্ভব হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের ও আশির দশকে এবং পরবর্তীকালে নারী আন্দোলনের বিষয়টি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। প্রধানত পশ্চিমীকরণের প্রভাবে আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া অনুঘটক হিসাবে নারী আন্দোলনকে উজ্জীবিত করেছে। ঐতিহ্যের বৈপ্লবিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে, ক্রমান্বয়ে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া অনুসৃত হলে নারীবাদী কার্যকলাপের সাফল্য সুনিশ্চিত হয়। তবে পুরুষের ও সমাজের কর্তৃত্ব থেকে নারীজাতির মুক্তি সাধনের জন্য পরিবর্তনের গতি দ্রুততর হওয়া আবশ্যক।

ভারতের কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসৃত হল। কিন্তু উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সুফলসমূহ নারী-পুরুষ সমানভাবে পাচ্ছে না; পাচ্ছে পৃথকভাবে। শ্রমশক্তির ক্ষেত্রে মহিলাদের থেকে পুরুষের উপস্থিতি বা অস্তিত্ব অনেক বেশি। অনেক ক্ষেত্রের পুরুষদের থেকে মহিলাদের কম পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। মহিলাদের আঞ্চলিক সচলতা অনেক কম। আবার সম্পদ-সামগ্রী, শিক্ষা-দীক্ষা, প্রযুক্তি-প্রশিক্ষণ, চাকরি-বাকরি প্রভৃতির উপরও মহিলারা নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে। তেমনি আবার ভারতে কন্যা সন্তানের সংখ্যাও ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। পুঁজিবাদী আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার সুবাদে ভারতে কর্মরত মহিলাদের ঘর-গৃহস্থালির কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে, সন্তান পালনের দায়িত্বটাও সামলাতে হয়। কর্মরত মহিলাদের সাধারণত অধিকতর সময়ব্যাপী এবং কষ্টসাধ্য কাজকর্ম করানো হয়। এ বিষয়ে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, লিঙ্গগত পার্থক্য হল একটি জৈবিক পার্থক্য, কিন্তু নারী-পুরুষের মধ্যে যে পার্থক্য তা সামাজিক পৃথকীকরণের বিষয়। এই পৃথকীকরণ বাঞ্ছনীয় নয়; এর পরিবর্তন সাধন আবশ্যক। তার জন্য দরকার সাংস্কৃতিক বিপ্লব। রাজনীতিক সমাজবিজ্ঞানী রত্না কাপুর ও বৃন্দা কসম্যান (Ratna Kapur and Brenda Cossman) তাঁদের *Subversive Sites : Feminist Engagements with Law in India* শীর্ষক গ্রন্থে

এ বিষয়ে বলেছেন : "Although women in India live in an enormous diversity of family norms we believe that it is nevertheless possible to identify a dominant ideology of family that informs the legal regulation of women. Familial ideology constructs the family as the basic and sacred unit in society, and women's role as wives and mothers as natural and immutable."

ভারতের সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে রাষ্ট্রপরিচালনা সম্পর্কিত অন্যতম নির্দেশমূলক নীতি হিসাবে বলা হয়েছে যে, সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন করতে হবে। কিন্তু সংবিধানের এই নির্দেশমূলক নীতি অদ্যাবধি বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। শাহবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় ছিল অনেকাংশে এই লক্ষ্যের অনুসারী। কিন্তু পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে সুপ্রিম কোর্টের সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তকে অতিক্রম করার ব্যবস্থা করে। উদারপন্থী মুসলমানদের হতাশা ও বিরক্তি সত্ত্বেও, মুসলমান সাম্প্রদায়িক ভোট হারানোর আশঙ্কায় সমকালীন ক্ষমতাসীন রাজনীতিক দল পার্লামেন্টের মাধ্যমে এ রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কেবলমাত্র ভোট জোগাড়ের রাজনীতিক বাসনার তাড়নায়, মুসলমান মহিলাদের স্বার্থবিরোধী এ রকম রক্ষণশীল একটি পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের নারীজাতি স্বাধীনতা সংগ্রামে শামিল হয়েছে। গান্ধি-নেহরুর আমলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু স্বাধীন ভারতের রাজনীতিক কাঠামো ও প্রক্রিয়ায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি হতাশাজনক। একবিংশ শতাব্দীতেও এ ক্ষেত্রে অভিপ্রেত অগ্রগতি ঘটেনি। বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব নিতান্তই নগণ্য। আইনসভায় মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং ক্রমহ্রাসমান। রাজনীতিক দলগুলি কম সংখ্যক মহিলা প্রার্থীদের নির্বাচনী টিকিট দেয়। পুরুষপ্রধান সমাজব্যবস্থারই এ হল এক প্রতিচ্ছবি। সামাজিক-রাজনীতিক ব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন ব্যতিরেকে এই ধারার পরিবর্তন সাধন দুরূহ ব্যাপার। রাজনীতিক দলগুলি নারীজাতির স্বার্থ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে লম্বাচওড়া কথা বলে; কিন্তু আইন বিভাগীয় ও শাসন বিভাগীয় সংস্থাসমূহে নামমাত্র মহিলাদের জায়গা দেয়। স্বভাবতই মহিলাদের বিবিধ ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা বা অধিকার-স্বাধীনতার বিষয়াদি অবহেলিত থেকে যায়।

নারীজাতির স্বতন্ত্র স্বার্থ ও উন্নয়ন এবং পার্লামেন্ট ও রাজ্য আইনসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিষয়াদি বিচার-বিবেচনা করার জন্য ভারত সরকারের সমাজ ও নারী কল্যাণ মন্ত্রক 'ভারতে মহিলাদের মর্যাদা' সম্পর্কে একটি কমিটি গঠন করে। ১৯৭৪ সালে সংশ্লিষ্ট কমিটি 'Towards Equality' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন পেশ করে। এই কমিটিও কিন্তু সংসদে বা রাজ্য আইনসভায় মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের সুপারিশ করেনি। এ বিষয়ে বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করা হয় : (১) নারীজাতির ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুর যুক্তি খাটে না। কারণ মহিলারা কোনো জনসম্প্রদায় নয়; মহিলারা হল একটি বর্গ বা ভাগ। (২) নারী জাতির স্বার্থকে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর বা শ্রেণির আর্থনীতিক, সামাজিক ও রাজনীতিক স্বার্থসমূহ থেকে স্বতন্ত্র করা সম্ভব নয়। (৩) মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনী ক্ষেত্র তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সংকুচিত করবে। (৪) নারী জাতির জন্য পৃথক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা জাতীয় সংহতির বিরোধী। কারণ অন্যান্য জনসম্প্রদায় ও স্বার্থগোষ্ঠী সমভাবে স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্ব দাবি করবে। (৫) মহিলাদের উচিত সাম্যের ভিত্তিতে সমভাবে প্রতিযোগিতায় শামিল হওয়া। (৬) নারী-পুরুষ নির্বিশেষ প্রগতিশীল সকল মানুষ সব সময়ই মহিলাদের স্বার্থকে সমর্থন করে। (৭) মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা একবার স্বীকার করে নিলে, তা আর প্রত্যাহার করে নেওয়া সম্ভব হবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা আবশ্যক যে, উপরিউক্ত কমিটি গ্রামীণ স্তরে বিধিবদ্ধ মহিলা পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছে। মহিলা পঞ্চায়েত গ্রামপঞ্চায়েতের সমান্তরাল সংগঠন হিসাবে নয়, পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। মহিলা পঞ্চায়েতের স্বাতন্ত্র্য-স্বাধিকার ও নিজস্ব আর্থিক সঙ্গতি থাকবে। নারী ও শিশুদের উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও পরিচালনা করবে মহিলা পঞ্চায়েত। মহিলা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণের হার এবং মান-মাত্রা বৃদ্ধি পাবে।

নারীজাতির জন্য সংরক্ষিত প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি নিয়ে কালক্রমে রাজনীতিক মতামতের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বিংশ শতাব্দীর নব্বই-এর দশকে পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহে মহিলাদের জন্য তেত্রিশ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়। পার্লামেন্ট এবং রাজ্য আইনসভাসমূহে অনুরূপ সংরক্ষণের ব্যাপারে বিভিন্ন মহিলা সংগঠন এবং দলমত নির্বিশেষে রাজনীতিক নেতাদের তৎপরতা দেখা যায়। এ বিষয়ে সম্প্রতি একটি সংশোধনী বিল ব্যাপকভাবে সমর্থিত হয়েছে। কিন্তু নারী আন্দোলনের একটি অংশ এই উদ্যোগের কতকগুলি সীমাবদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। (১) মহিলা প্রার্থীরা দলের পুরুষ নেতাদের উপর নির্ভরশীল। স্বভাবতই নির্বাচনী রাজনীতিতে মহিলা প্রার্থীদের দলের পুরুষ নেতাদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। (২) সংরক্ষণের কোটার মাধ্যমে একটি সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত হয়ে যাবে; উন্নয়নের সম্ভাবনাযুক্ত ন্যূনতম মান নির্ধারিত হবে না। (৩) মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ বিলে অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক কোনো কোটার কথা বলা হয়নি। এমতাবস্থায় উচ্চবর্ণ ও শ্রেণির শিক্ষিত মহিলাদেরই নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ-সম্ভাবনার সৃষ্টি হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা আবশ্যক যে, নারীজাতি বলতে সমপ্রকৃতির কোনো জনগোষ্ঠীকে বোঝায় না। নারীজাতির মধ্যে অবস্থা ও স্বার্থগত বিবিধ পার্থক্য বর্তমান।

১৯৮০-৮৫ সালে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথম মহিলাদের জন্য উন্নয়নমূলক কর্মপরিকল্পনা নিয়ে পৃথক একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়। নারী জাতির স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও চাকরি-বাকরির উপর জোর দেওয়া হয়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মহিলাদের ক্ষমতাবান করার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়। দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মহিলাদের জন্য মৌলিক মানবিক পরিষেবাসমূহ প্রদান, আর্থনীতিক আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি, নারী-পুরুষের সুবিচার সুনিশ্চিতকরণ প্রভৃতি বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর জোর দেওয়া হয়।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, বিদ্যমান সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের মর্যাদাগত অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য আইনমূলক ব্যবস্থাদি স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে সফল হতে পারে না। মহিলাদের সামগ্রিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য অন্যান্য পথেও উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করতে হবে। এই ভাবে এক সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নারীমুক্তি আন্দোলনের বিষয়টিকে সংগঠিত ও পরিচালিত করতে পারলে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারীজাতির প্রতি ন্যায়বিচার করা সম্ভব হবে। এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। নিজেদের অধিকারসমূহ সম্পর্কে মহিলাদের সম্যকভাবে সচেতন করা আবশ্যক। কিন্তু শহরাঞ্চলে এবং গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের সচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে অভিন্ন উপায়-পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত হবে না। তাতে সুফল পাওয়া যাবে না। এ বিষয়ে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারী অবদমন ও নারী নিপীড়ন সম্পর্কিত সমস্যাটিকে সবদিক থেকে মোকাবিলা করার চেষ্টা করতে হবে। তা হলেই সুফল পাওয়া যাবে; অন্যথায় যাবতীয় উদ্যোগ-আয়োজন অর্থহীন প্রতিপন্ন হবে। শ্যামাচরণ দুবের অভিমত অনুযায়ী আধুনিক ভারতের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় নারী-পুরুষের মধ্যে অসাম্য-বৈষম্য অব্যাহত রাখার প্রক্রিয়াই পরিলক্ষিত হয়। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার অর্জন করতে গেলে নারীজাতিকে এখনও দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে এবং সংগ্রামের শামিল থাকতে হবে। *Indian Society* শীর্ষক গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেছেন : "The social and political system appears geared to continue gender inequality. It seems that the march to equality will be long and tortuous."

নারী জাগরণের সমর্থক সমাজতত্ত্ববিদগণকে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদের মর্যাদাগত অবস্থান সম্পর্কিত আলোচনায় বিশেষভাবে আগ্রহী দেখা যায়। এই শ্রেণির সমাজতত্ত্ববিদগণের মধ্যে মহিলা সমাজবিজ্ঞানীর মতো পুরুষ সমাজবিজ্ঞানীও আছেন। নারীবাদী সমাজতত্ত্ববিদদের মধ্যে অনেকে নারীমুক্তির উদ্দেশ্যে বিবিধ উদ্দীপক প্রস্তাব পেশ করে থাকেন। এই সমস্ত প্রস্তাবের মধ্যে কতকগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহিলাদের অসহায়বোধ একেবারে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে। নারী 'অবলা ও অসহায়' এই ধারণার আশু অবসান আবশ্যক। সনাতন ভারতীয় সমাজব্যবস্থার সাবেকি মূল্যবোধসমূহ পরিত্যাগ করে নারীজাতিকে আধুনিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী ও আস্থাশীল হতে হবে। পরিবারের মধ্যে জায়া-জননীর ভূমিকা এবং পরিবারের

বাইরের কর্মজীবনের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। তাছাড়া বিভিন্ন মূল্যবোধ ও বিষয়কে প্রতিফলন প্রদান করতে হবে। সমাজবিজ্ঞানী আহুজা (Ram Ahuja) তাঁর *Society in India* শীর্ষক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : "Unless women gives as much importance to her 'Worker's role in the labour market' as to her 'expressive female role', discrimination against women will not be easy to end." বস্তুত নারী জাগরণ বা নারীমুক্তি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিককালের সমাজতত্ত্বের আলোচনায় নতুন একটি শাখা সৃষ্টি হয়েছে। সমাজতত্ত্বের এই শাখাটির নাম হল 'মহিলাদের সমাজতত্ত্ব'। মহিলাদের সমাজতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদির মধ্যে দুটি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটি বিষয় হল : মানুষ হিসাবে পুরুষের মতোই নারীর গুরুত্ব প্রতিপন্ন করা এবং সমাজে মহিলাদের অবদমিত অবস্থানকে একটি সামাজিক সমস্যা হিসাবে প্রতিপন্ন করা।

১৩.১৫ জাতীয় মহিলা কমিশন (National Commission for Women)

স্মরণাতীত কাল থেকে মহিলা কমিশন গঠিত হবার আগে পর্যন্ত, ভারতীয় নারীরা অবহেলিত ছিলেন। এ অবহেলা পারিবারিক, সামাজিক সর্বস্তরেই। ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতারা সচেতনভাবে নারী- পুরুষের সম-অধিকারের কথা লিখে গেছেন। একথা স্বীকৃত অধিকার হিসাবে ঘোষিতও হয়েছে। পার্লামেন্টে বহুবার নারীরা অবিচার, অসাম্য, বৈষম্য ও নিগ্রহের শিকার হয়ে আসছে আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোয় পরিবর্তন না আসার জন্য।

শুধু এ দেশেই নয়, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেও এই বৈষম্য ও অবিচার এক সামাজিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। সেজন্য সত্তরের দশকের প্রথমে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষ থেকে নারী-দশকের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির কাছে নারীর অবস্থান ও অধিকার নিয়ে বিশেষ চিন্তাভাবনা প্রসূত এক কর্মসূচি গ্রহণের আবেদন জানানো হয়।

আমাদের দেশের মহিলা সমাজ, এদেশের নারীর শুধুমাত্র মঙ্গল নয়, উন্নতির দিকে লক্ষ রেখে সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচি গ্রহণ করার দাবিতে সোচ্চার হয়। ১৯৭২ সালে ড. ফুলরেণু গুহের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'Committee on the Status of Women in India' বা 'Status Committee'। এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল নারীদের নানারকম সমস্যা, তাদের প্রতি অবিচার ও বৈষম্যের অবস্থাকে খতিয়ে দেখা এবং একটি সুপারিশ তৈরি করা। কমিটির অন্যতম সুপারিশ ছিল জাতীয় স্তরে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি মহিলা কমিশন গঠন। এছাড়া এই কমিটি পরিকল্পনা কমিশনে মেয়েদের জন্য উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রচনার জন্য সুপারিশও করে। এই কমিটির সুপারিশ মেনেই সরকার কয়েকটি পরিকল্পনা করে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন ও সংশোধনও করে। এই কমিটির সুপারিশে মহিলাদের সমানাধিকারের দাবি সোচ্চার হয়ে ওঠে।

এই কমিটির সুপারিশেই ১৯৮৭ সালের জানুয়ারিতে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে শ্রীমতী এলা ভাটের নেতৃত্বে গঠিত হয় "শ্রমশক্তি কমিশন"। এর উদ্দেশ্য ছিল স্বনির্ভর কর্মজীবী মহিলাকর্মী এবং অসংগঠিত মহিলা শ্রমিকদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার সমীক্ষা ও তার ভিত্তিতে সুপারিশ করা। এই কমিশনের সমীক্ষায় অসংগঠিত মহিলা শ্রমিক ও কর্মজীবীদের এক করুণ ও ভয়াবহ চিত্র ফুটে ওঠে। এর ভিত্তিতেই ১৯৮৮ সালের জুন মাসে সুপারিশ পেশ করা হয়। ওই বছরই অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের শিশু ও নারীকল্যাণ দপ্তর মহিলাদের অবস্থার উন্নতির জন্য একটি "প্রেক্ষিত পরিকল্পনা" রচনা করে। এই পরিকল্পনা মহিলাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ও স্বনির্ভর প্রকল্প রূপায়ণের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে মহিলা উন্নয়ন নিগম (Women Development Corporation) গঠনের সুপারিশ করে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচার ও বৈষম্যে পীড়িত নারী সমাজের সমস্যার সমাধানের জন্য উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন মহিলা কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু এই কমিশন গঠনের জন্য কোনো কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। চলতি প্রশাসনিক ব্যবস্থায় মহিলাদের সমস্যার দিকে নজর দেওয়া বা সমাধানের জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অত্যাচারিতা বিপন্ন নারীরা তাদের সমস্যাগুলোর কথাও যথাস্থানে জানাতে পারছেন না। ফলে তাদের সমস্যাগুলোরও সমাধান হচ্ছে না। দেশের জনসংখ্যার অর্ধাংশ এই অসম অবস্থার শিকার হওয়ায় দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। তাই দেশের বিভিন্ন মহিলা সংগঠন কেন্দ্রে ও রাজ্যে মহিলা কমিশন গঠনের জন্য তৎপর ও সোচ্চার হয়ে ওঠে।

মহিলা সংগঠনগুলির এই দাবি মেনে নেন তৎকালীন মোর্চা সরকার। এই সরকার জাতীয় মহিলা কমিশন গঠনের জন্য ১৯৯০ সালে পার্লামেন্টে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করেন। ওই বছরই বিলটি পাস হয় এবং এটি কার্যকরী হয় ১৯৯২ সালের ৩১শে জানুয়ারি।

এই আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার একজন সভাপতি ও ছয়জন সদস্য সমন্বিত জাতীয় মহিলা কমিশন গঠন করেন এবং রাজ্যগুলিকে ওই ধরনের মহিলা কমিশন গঠনের জন্য সুপারিশ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন (West Bengal Women's Commission) গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করেন। এই কমিশনের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি।

এই কমিশন মহিলাদের কাছে সংবিধানগত ও আইনগত রক্ষাকবচের মতো। নারী-জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমানাধিকার রক্ষায় এবং বঞ্চনার প্রতিকারে সাহায্যের হাত প্রসারিত করার দায়িত্বও এই কমিশনের।

গঠন : জাতীয় মহিলা কমিশন আইন (National Commission for Women Act, 1990)-এর ২য় অধ্যায়ের ৩নং ধারায় জাতীয় মহিলা কমিশন গঠন সম্পর্কে আলোচনা আছে।

১। কেন্দ্রীয় সরকার মহিলাদের কল্যাণার্থে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার সম্পন্ন জাতীয় মহিলা কমিশন গঠন করেন ১৯৯০ সালে।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়—

(ক) নারী সেবামূলক কাজে উৎসর্গীকৃত প্রাণ মহিলাকে সভানেত্রী নির্বাচন করেন কেন্দ্রীয় সরকার।

(খ) কর্মদক্ষ, সৎচরিত্র, আইনজ্ঞ, শিল্পবাণিজ্য অথবা শিল্পসংস্থার সক্রিয় কর্মী, মহিলাদের ক্ষমতানুযায়ী কর্মবিনিয়োগ বৃদ্ধিতে নিযুক্ত কোনো দক্ষ এবং অর্থনৈতিক উন্নতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সমাজসেবামূলক কর্মোন্নয়নে উৎসর্গীকৃত মহিলাদের মধ্যে পাঁচজনকে কেন্দ্রীয় সরকার সদস্য নির্বাচন করবেন। এই সদস্যাদের মধ্যে একজনকে তপশিলি জাতি ও আর একজনকে তপশিলি উপজাতির অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

(গ) কেন্দ্রীয় সরকার এমন একজনকে সদস্য-সচিব মনোনীত করবেন যিনি—

(অ) ব্যবস্থাপনায়, প্রাতিষ্ঠানিক গঠনে অথবা সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক আন্দোলনে অভিজ্ঞ, অথবা

(আ) কেন্দ্রীয় সরকারের 'সিভিল সার্ভিস' বা সর্বভারতীয় চাকরি অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের অসামরিক পদে কর্মরত একজন উপযুক্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আধিকারিক।

৩। কমিশনের আধিকারিক এবং অন্যান্য কর্মীগণ—

(ক) কেন্দ্রীয় সরকার কমিশনের কাজের উৎকর্ষের জন্য সুদক্ষ কর্মীদের এবং আধিকারিকদের নিয়োগ করবেন।

(খ) কমিশনের আধিকারিকরা এবং অন্যান্য কর্মীরা তাদের চাকরির শর্ত অনুযায়ী বেতন ও ভাতা পাবেন।

জাতীয় মহিলা কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি : জাতীয় মহিলা কমিশন তার পালনীয় নিম্নলিখিত কাজগুলো অথবা এর যে-কোনো একটি কাজ করতে পারেন—

(ক) সংবিধান ও আইনে অনুমোদিত মহিলাদের মঙ্গল ও সুরক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো অনুসন্ধান তদন্ত ও পরীক্ষা করবে।

(খ) মহিলাদের সুরক্ষা সম্পর্কিত কাজের রিপোর্ট কমিশন বছরে একবার অথবা প্রয়োজনে অন্য সময়েও পেশ করতে পারেন।

(গ) কেন্দ্রীয় সরকার ও যে-কোনো রাজ্য সরকার যাতে মহিলাদের অবস্থার উন্নতিকল্পে সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদন ও সুপারিশ কাজে পরিণত করে তা দেখবে এই কমিশন।

(ঘ) মহিলাদের জন্য সংবিধান প্রদত্ত আইন বা অন্যান্য আইনের ত্রুটি সংশোধন করা এবং সংযোজন ও পরিবর্তন করা কমিশনের কাজ।

(ঙ) এই কমিশন মহিলা-সংক্রান্ত সংবিধানগত আইন এবং অন্যান্য আইন ভঙ্গের ব্যাপারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পাশে দাঁড়াতে পারে।

(চ) নিম্নলিখিত অভিযোগ এলে তা খতিয়ে দেখে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেমন—

(অ) মহিলাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে;

(আ) মহিলাদের সুরক্ষায় সমভাব রক্ষা এবং বিধিবদ্ধ আইন প্রয়োগ না করলে;

(ই) মহিলাদের দুঃসহ কষ্ট লাঘব করে তাদের মঙ্গলের আশ্বাস দেওয়া এবং মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত কর্মনির্দেশিকা না মানলে;

(ছ) নারীদের উপর বৈষম্যমূলক এবং নিষ্ঠুর আচরণ থেকে উদ্ভূত নির্দিষ্ট সমস্যা এবং পরিস্থিতির অনুসন্ধান করে তাদের উন্নয়নের পথে বাধাগুলোকে দূর করার জন্য কৌশল অবলম্বন করা।

(জ) মহিলাদের সর্বক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করার পথ সুনিশ্চিত করার জন্য তাদের পদোন্নতি এবং শিক্ষাবিষয়ক গবেষণার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে কমিশনকে। তাদের উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টিকারী কারণগুলো হল—

(১) আবাসনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকা; মৌলিক পরিষেবা না পাওয়া;

(২) সহায়ক পরিষেবা পর্যাপ্ত না হওয়া প্রভৃতি। এই কারণগুলোকে চিহ্নিত করা এবং প্রযুক্তিগত প্রকৌশলের সাহায্যে তাদের কাজের একঘেয়েমি দূর করা এবং স্বাস্থ্যজনিত বিপদ কমিয়ে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো কমিশনের কাজ।

(ঝ) নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ এবং উপদেশ দান;

(ঞ) কেন্দ্র এবং যে-কোনো রাজ্যের মহিলাদের উন্নয়নের অগ্রগতির মূল্যায়ন;

(ট) জেল, হাজত, মহিলাদের সংস্থা অথবা যেসব স্থান বন্দিনী মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট সেসব স্থান পরিদর্শন করে, প্রয়োজন বুঝলে তাদের সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

(ঠ) বিপদগ্রস্ত বা দুস্থ বিরাট সংখ্যক মহিলাকে মোকদ্দমায় সাহায্যের জন্য তহবিল গঠন;

(ড) মহিলা সংক্রান্ত যে-কোনো ব্যাপারে অথবা কর্মরতা মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন অসুবিধার কথা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা;

(ঢ) কেন্দ্রীয় সরকার যে-কোনো বিষয় এখানে বিবেচনার জন্য পাঠাতে পারে।

১৩.১৬ পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন (West Bengal Commission for Women)

গঠন : মহিলা কমিশনের আইনানুযায়ী সদস্য সংখ্যা ১১ জন। রাজ্য সরকার সভানেত্রী ও সহ-সভানেত্রীকে মনোনীত করেন। বাকি ৯ জন সদস্যের নিযুক্তির ভারও রাজ্য সরকারের। যে সব মহিলা আইন-

কানুন সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্না, নারীসমস্যা সংক্রান্ত গবেষণামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত, নারীকল্যাণ ও সমাজসেবার সঙ্গে যুক্ত এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত, তাদের মধ্যে থেকেই কমিশনের সদস্য নিয়োগ করা হবে। সদস্যদের মধ্যে তপশিলি জাতি ও উপজাতির একজন করে সদস্য থাকবেন। "পদাধিকারবলে সমাজকল্যাণ দপ্তরের সচিব" কমিশনের সদস্য সচিব হবেন। তিনি ছাড়া অন্যান্য সদস্যদের কার্যকাল তিন বছরের বেশি হবে না।

এই কমিশন প্রতি ছয় মাস অন্তর রাজ্য সরকারকে কাজের রিপোর্ট দেবে। এছাড়া এই কমিশন বিভিন্ন বিষয়ে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দিতে ও সুপারিশ করতে পারবেন। অবশ্য চূড়ান্ত পর্যায়ে কোনো প্রশাসনিক ক্ষমতা এই কমিশনের হাতে দেওয়া হয়নি।

☞ **পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি :** (১) মহিলা কমিশনকে আইনসম্মত স্বয়ংনির্ভর কমিশনের স্বীকৃতি দিয়েছে "পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন"। মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কাজ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজকল্যাণ দপ্তর এই কমিশন ও রাজ্য সরকারের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষাকারী বা liaison হিসাবে থাকবেন।

(২) আইনত এই কমিশন দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছে। কোনো ঘটনার তদন্তের ব্যাপারে বা কোনো নির্দিষ্ট অভিযোগে ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের উপর সমন জারির ক্ষমতা কমিশনের আছে। তাদের জেরা করা ও সাক্ষ্য গ্রহণ করার ক্ষমতাও এর আছে। নিজে তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিদানের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করতে পারে।

(৩) মহিলাদের উপর বৈষম্য ও অবিচার দূর করার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমীক্ষা চালিয়ে প্রচলিত আইন সংশোধন বা পরিবর্তন অথবা সংযোজন কিংবা নতুন আইন প্রণয়নে রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ করতে পারবেন এই কমিশন।

(৪) মহিলারা পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অবিচার ও অত্যাচারের শিকার হলে, শিক্ষা ও কর্মনিযুক্তি ক্ষেত্রে বৈষম্য ও অবিচারের শিকার হলে, কমিশন যেমন একদিকে প্রচলিত আইনের ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা খতিয়ে দেখে সুপারিশ করবেন, তেমনই অন্যদিকে আইন ও বিচার ব্যবস্থায় মেয়েরা উপযুক্ত সাহায্য পাচ্ছেন কিনা বা কীভাবে পেতে পারেন তাও দেখবেন এবং রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের কাছে তা জানাবেন।

(৫) কমিশন তার দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ করে মহিলাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক বিরোধের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দুই পক্ষকে সমন জারি করে, সাক্ষ্য গ্রহণ করে শুনানির ভিত্তিতে পরামর্শ দিতে পারেন অথবা বিষয়-সম্পত্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করবেন। কিন্তু আদালতে বিবেচনাধীন বিষয়ে মতামত দিতে পারবেন না। মহিলা কমিশনের হাতে কোনো সুস্পষ্ট প্রশাসনিক ক্ষমতা না থাকায় তারা কোনো সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে পারেন না। এই কমিশন মহিলাদের আইনগত অধিকার রক্ষিত হচ্ছে কিনা তা দেখার সঙ্গে সঙ্গে আইনভঙ্গের ঘটনাগুলির তদন্ত করবে এবং রাজ্য সরকারকে নীতিগত বিষয়ে উপদেশ ও পরামর্শ দেবে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে মহিলা কল্যাণমূলক বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে রাজ্য সমাজকল্যাণ দপ্তর, রাজ্য সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদ বা কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ অনুদান ও অনুমোদন দেয়। কিন্তু রাজ্য মহিলা কমিশনের আইনত সে ধরনের কোনো ক্ষমতা নেই। মহিলাদের সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে সমীক্ষা করে তথ্য সংগ্রহ করা, তাদের সুশিক্ষিত এবং সচেতনা করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কমিশন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও মহিলা সংগঠনগুলির মাধ্যমে মহিলাদের প্রতি অত্যাচার, অবিচার ও বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করার জন্য এবং তাদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচার চালাতে পারেন। ব্যক্তিগতভাবে অত্যাচারিতা, নিগৃহীতা, বঞ্চিতা কোনো মহিলা উপযুক্ত তথ্য ও প্রমাণসহ লিখিত অভিযোগ মহিলা কমিশনের কাছে পেশ করলে মহিলা কমিশন তার যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন এবং অভিযোগকারিণীকে আইনি পরামর্শ দেবেন। এছাড়া কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমস্যাটির সমাধানের জন্য কমিশন কথাবার্তা বলবেন।

মহিলা নিগ্রহ জনিত ঘটনার সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই কমিশন প্রতিবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। এই নিগ্রহের ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধের জন্য জনগণকে সচেতন করার দায়িত্বও কমিশনের।

☞ **মহিলা কমিশনের মূল্যায়ন :** মহিলা সমাজের বিভিন্ন সমস্যার প্রতিকারার্থে এবং তাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য গঠিত মহিলা কমিশন একটি ফোরাম বা মঞ্চ। এই কমিশনের উদ্দেশ্য মহৎ হলেও শক্তি সীমিত। এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়েই নারীকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, তার মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও আন্দোলন সংগঠনের ক্ষেত্রে এবং সমস্যাগুলি সর্বসমক্ষে তুলে ধরা ও তার সমাধানের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই কমিশন বদ্ধপরিকর।

মহিলাদের সুরক্ষার জন্য মহিলা কমিশনের কার্য তালিকায় আছে সংবিধান ও আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ব্যাপারে পরিবর্তন আনা। এছাড়াও এই তালিকায় আছে নারীর পদমর্যাদা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ও তাদের অভিযোগের প্রতিকার করা। পণপ্রথা বিলোপ, কন্যা ভ্রূণ হত্যা রদ এবং 'পারিবারিক মহিলা লোক আদালত' গঠন ইত্যাদিও এর কাজের মধ্যে পড়ে। কর্মশালা সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করে মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করাও এর আরও একটি কাজ। এছাড়া এই কমিশন সামাজিক অমঙ্গলের হাত থেকে মহিলাদের রক্ষা করার চেষ্টাও করে।

নারী আন্দোলনের পথে মহিলা কমিশন একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হলেও তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বলেই নারীর সমস্যাগুলোকে চূড়ান্ত সমাধানের পথ দেখাতে পারে না। তাই আন্দোলনের মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, নারী মুক্তি আন্দোলনকারী মহিলা সংগঠন এবং সমাজ সচেতন মানুষকে সঙ্গী করেই নারী কল্যাণে ব্রতী হতে হবে এই কমিশনকে।